দেশ বিদেশের গল্প

কিরণশঙ্কর মৈত্র



॥ দেশ-বিদেশের গল্প ॥

৬০

কিরণশঙ্কর মৈত্র

মুখার্জী ব্রাদার্স । কলকাতা-৯

॥ দেশ-বিদেশের গল্প ॥

৯০

কিরণশঙ্কর মৈত্র

মুখার্জী ব্রাদার্স । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

প্রকাশক
সুকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
সোমনাথ ঘোষ

দাম : আট টাকা

দুই দুষ্টু-মিষ্টিকে

সূচী

এক ॥ লাহুলী কন্যার দুঃখ

দুই ॥ রাজা ও অন্ধ

তিন ॥ হিমাচলের এক চন্দ্রকমল

চার ॥ বাদশাহ্ কেকিলে ও ছুতোর মিস্ত্রী

পাঁচ ॥ চন্দ্রানদীর পারে

ছয় ॥ হাওয়ায় বিষের শব্দ

সাত ॥ লুয়ার রাজকুমারী

আট ॥ লাহুলের ভূতিনী

নয় ॥ বরুণদেব আর বিজলীরাণীর কাহিনী

দশ ॥ রোতাং-এর কিম্বদন্তী

এগারো ॥ বর্মা পাহাড়ের খুন সান আর নান য়ু পীন

বারো ॥ মিওলের দেবী চামুণ্ডা ও এক বুড়ি

তের ॥ চাষী বউ ও চার কাঠ-পুতুল

চৌদ্দ ॥ কুলু দশেরার কাহিনী

পনের ॥ নিদাঘের হরিণী

ষোল ॥ কিন্নরের দুঃখী রাজকুমার ও রাজকুমারী

সতের ॥ জোম্বা ও লুলু

এই সঙ্কলনে কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের গল্প। অধিকাংশই নানা উপজাতির লোক-কথা ভিত্তিক। জোম্বা-লুলুর কাহিনী যদিও দুটি আফ্রিকান উপজাতির দুই ব্যথা-দীর্ণ নর-নারীর, কিন্তু তা আধুনিক কালের। এর স্বাদও একটু আলাদা। বৈচিত্র্যের কথা ভেবে এই কাহিনীটিকেও বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।



লাহুলী কন্যার দুঃখ

বর্তমানের হিমাচল প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আগেকার বহু দেশীয় রাজ্য। হিমাচলের সবচেয়ে দুর্গম জেলা লাহুল-স্পিতি তের হাজার থেকে বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। প্রতিবেশী কুলুর রাজা জিতা সিং একদা লাহুল-স্পিতি জয় ক'রে নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে—কুলুর সঙ্গে লাহুল-স্পিতির মানুষের আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হোক। রাজার অনেক রাণী, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ লাহুলের মেয়ে ছিল না। তাই তিনি ভাবলেন—লাহুলের কোনো সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে ক'রে লাহুল রাজ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করবেন।

রাজা তার অনুচরদের আদেশ দিলেন—ত্রিশ দিনের মধ্যে লাহুলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে খুঁজে আনবার জন্যে।

লাহুলের গ্রামে গ্রামে এই কথা প্রচারিত হয়ে গেল। রাজার একজন সুবেদার ঘোষণা করলেন যে—দশদিন পরে শাম্‌সা গ্রামে এক মেলা বসবে রাজার জন্মদিন-উৎসব উপলক্ষে। সেই মেলায় সবাই-র নিমন্ত্রণ।

মেলায় দোকানপাট লোকজনের খুব ভিড়। কোনো উৎসবের সুযোগ হলেই লাহুলীরা তার সদ্ ব্যবহার করে। মেয়েরা নানা জায়গা থেকে আসে তাদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ আর নানারকম অলঙ্কার পরে। মেয়ে-পুরুষ সবাই বার্লি দিয়ে বানানো মগ মগ চ্ছাং-মদ আকণ্ঠ পান করে আর নৃত্য-গীতে মত্ত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পা ব্যথা হয়।

রাজার মন্ত্রী এবং পারিষদরা বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রেছিল যাতে এই মেলায় লাহুলের সব তরুণীরা যোগ দেয়। তারপর তাদের মধ্য থেকে সব দিক দিয়ে বিচার করে তারা ছটি রূপসী মেয়েকে বেছে নিল খোঁজখবর নেবার জন্যে। জানা গেল—প্রথম তরুণীটির আগেই বিয়ে হয়ে গেছে মালাং গ্রামের তেন্দুর সঙ্গে। বাকী থাকে ধোন্‌সা গ্রামের সুন্দরী রসিলী। রসিলী মেলার পরে গাঁয়ে ফিরে গেল। জানতেও পারল না—তার জন্যে কী চমকপ্রদ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে! পরের দিন ধোনসার লোকেরা দেখল তাদের গাঁয়ে রাজার লোকেরা। গাঁয়ের মুখিয়ার (প্রধানের) বাড়িতে তাঁদের নিয়ে ড্রাগন আঁকা তিব্বতী কার্পেটের উপর বসতে দেওয়া হলো। আপ্যায়ন করা হলো চ্ছাং, মাখন চা, বার্লি-ছাতুর পিঠে দিয়ে। তারপর গ্রামবাসীরা সবিনয়ে রাজার লোকেদের কাছে তাদের আগমনের কারণ জানতে চাইল। রাজার লোকেরা বলল—"তোমাদের গাঁ থেকে একটি মেয়েকে আমরা নিতে এসেছি। সে হবে রাজা জিতা সিংহের নতুন লাহুলী রাণী।"

"কে সে? কি নাম সেই মেয়েটির?"—গ্রামবাসীরা সমস্বরে জিজ্ঞেস করে।

এমন সময় চ্ছাং-এর পাত্র হাতে নিয়ে পরিবেশন করতে ঘরে ঢোকে রসিলী।

রাজার লোকেরা তাকে দেখে বলে ওঠে—"এই তো সেই মেয়ে। এ হবে আমাদের নতুন রাণী।"

এ-খবর কিন্তু গ্রাম-প্রধানের কানে সুধা বর্ষণ করল না। বরং তার মাথা ঘুরতে থাকে, জিভ শুকিয়ে আসে, তার সামনে ভেসে ওঠে শুধু বহুদিনের জমা কঠিন ঠাণ্ডা বরফের নিষ্প্রাণ জগৎ।

খানিকক্ষণ পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে রাজার লোকেদের কাছে বহু অনুনয়-বিনয় করতে লাগল তার মেয়েকে না-নিয়ে যাবার জন্যে —"রসিলী আমার একমাত্র মেয়ে—একমাত্র সন্তান—বৃদ্ধ বয়সের ভরসা। ওকে নিয়ে গেলে কে আমাকে দেখবে? কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে কে ঘর গরম রাখবে? চ্ছাং বানিয়ে কে খাওয়াবে? আমি তো ঠাণ্ডাতেই মরে যাব।"

কিন্তু রাজার লোকেরা বুড়ো মুখিয়ার কোনো কথাই শুনল না। রাজাদেশ অমান্য করে তারা কি নিজেদের জীবন খোয়াবে? এক ঘণ্টার মধ্যে তারা রসিলীকে তৈরী হয়ে নিতে বলল।

রসিলীর মন দুঃখে ভরে গেল। কিন্তু রাজাজ্ঞা অমান্য করে সে মা-বাবার দুঃখ আরও বাড়াতে চাইল না। তাড়াতাড়ি সে তৈরী হয়ে নিল, লাহুলের পোশাক ছেড়ে পরে নিল কুলু-বালার বসন।

তারপর সে উনুনের কাছে গেল। তার বন্ধুরা এক থালা আটা নিয়ে এলো। তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে সেই হাতের ছাপ এঁকে দিল উনুনের গায়ে। প্রতিবেশী মহিলারা তার সঙ্গে সঙ্গে তখন গাইছিল "—হে উনুন, তোমার উপর রান্না করে এতদিন বহু সুস্বাদু খাবার খেয়ে বাচ্চা বয়স থেকে এত বড় হয়েছি। আজ তোমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে যাচ্ছি।"

শান্তভাবে রসিলী পাল্কিতে উঠে বসল। বাহকেরা বরফে-ঢাকা পপলার গাছে ছাওয়া সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে কুলুর দিকে এগিয়ে চলল। জল-ভরা চোখে রসিলী পাল্কিতে উঠে তাকিয়ে রইল তার আবাল্যের পার্বত্যভূমির দিকে, প্রণাম জানাল দূর গেহান পর্বত শিখরবাসী গেহান দেবতার উদ্দেশে। সাতদিন ধরে চন্দ্রা উপত্যকার মধ্য দিয়ে, রোতাং পাশ পার হয়ে কুলুতে পৌঁছল। এই প্রথম রসিলী

চারদিকে অবাক হয়ে দেখল—কতো ফসলের ক্ষেত, ফল-ফুলের বাগান, পশু-পাখী। এখানে ঠাণ্ডা অনেক কম, আবহাওয়া মনোরম। তা হলেও ভারি বরফে-ঢাকা, প্রায় ফসলবিহীন লাহুলের জন্যে মন কাঁদতে লাগল রসিলীর।

রসিলীকে দেখে জিতা সিং খুব খুশী। তিনি যা ভেবেছিলেন—লাহুলী-কন্যা তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। ধুমধাম জাঁকজমকের মধ্যে রাজকীয় সমারোহে শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হলো। কুলুর অন্য রাণীরা ঈর্ষার বিষে জ্বললেও রসিলীকে সুখী করার সব রকম বন্দোবস্ত করলেন জিতা সিং। প্রতিদিন নৃত্য-গীত-অভিনয়-রঙ্গরস আনন্দের অনুষ্ঠান। কিন্তু রসিলীর অধরে কদাচিৎ ফুটে ওঠে হাসির রেখা। অলিন্দ থেকে সে তাকিয়ে থাকে গেহান পর্বতের দিকে—যেখানে গেহান দেবতার অধিষ্ঠান।

পাখী আর মৌমাছিরা জানত বাপের বাড়ির জন্যে রসিলীর মনের দুঃখের কথা। লাহুল থেকে উড়ে আসবার সময় তারা ঠোঁটে করে নিয়ে আসত ঘোশাল পর্বতের পাথরের টুকরো, পপলার গাছের ডাল কুলু-রাজধানী নগরে, যেখানে থাকত রসিলী। রাজ-অন্তঃপুরে একটি ছোট দেবালয় বানিয়ে রসিলী তার চারদিকে জমিয়ে রাখতে লাগল সেই পাথর আর গাছের ডালের টুকরোগুলি। হিমাচলীরা বলেন—নগরে আজও দেখা যায় গাছপালায় ঘেরা সেই জায়গাটি যেখানে বাসা বানিয়ে আছে নানা রকম পাখী আর মৌমাছিরা।

কয়েক বছর কেটে যায়। একদিন রাজা জিতা সিং দুর্গপ্রাচীরের নীচেই কুস্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে সেরা কুস্তিগীররা এলো প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। অবশেষে সবাই পরাজিত হলো, বাকী রইল কেবল মাত্র দু'জন—একজন কুলু রাজদরবারের বহুবিজয়ী অপরাজিত কুস্তিগীর; আর অন্যজন লাহুলের এক অখ্যাত তরুণ মল্ল। এরা দুজনেই পরস্পরের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। একজনের রয়েছে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, অন্যজনার

তারুণ্যের সম্পদ। বহুসময় ধরে তাদের মধ্যে লড়াই চলল। কুলু-বীর তার সবরকম কসরৎ দেখিয়েও লাহুল-মল্লকে কাবু করতে পারল না। অবশেষে বয়স্ক কুলু-পালোয়ানের মধ্যে দেখা দিতে লাগল ক্লান্তির চিহ্ন। কিন্তু তখনও সে সমানে লড়ে যেতে লাগল। হঠাৎ দর্শকের মধ্যে প্রচুর চীৎকার-কোলাহল। লড়াই শেষ। ঘাসের উপর দেখা গেল পড়ে আছে পরাজিত, বিধ্বস্ত কুলুবীর।

রসিলীর মনে খুশীর জোয়ার। অলিন্দ থেকে ঝুঁকে স্মিতমুখে সে লাহুল তরুণকে অভিনন্দন জানাল, তার দিকে ছুঁড়ে দিল তার গলার মুক্তোর হার। এই দৃশ্য দেখে রাজা জিতা সিং ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তার রাজ্যের মল্লবীর হেরে গেছে আর তারই রাণী অভিনন্দন জানাচ্ছে বিপক্ষের বিজেতাকে। লাহুল-তরুণের প্রতি লাহুলী রাণীর এই বহুমূল্য অনুগ্রহের জন্যে রাজা তাকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে বিদ্ধ করলেন। রাণী রসিলী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে—রাজার ব্যবহার নৃপতিজনোচিত নয়। রসিলীর মন ভেঙে গেল। দীর্ঘদিন থেকে সে লাহুল, লাহুলী জনপদ ও পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তার উপর রাজার এই কটাক্ষ—তাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিল। সেদিন রাতে এক অতি বেদনা ভারাক্রান্ত মুহূর্তে দুর্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দিল সে।

তারপর কেটে গেছে তিনশ' বছর। কিন্তু আজও যদি কেউ নগর-দুর্গে রাত কাটায় নিদ্রাহীন নিশীথে শুনতে পায় নূপুর নিক্কণ, রমণী পদধ্বনি। হিমাচলে জনরব প্রচলিত যে—এক বিদেহী আত্মা ঘুরে বেড়ায় প্রাচীন নগর দুর্গের অলিন্দে অলিন্দে, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে।



রাজা ও অন্ধ

অতি প্রত্যুষে রাজা বীরভদ্র অরণ্যে গিয়েছেন মৃগয়ায়। সন্ধ্যের সময় যখন সঙ্গীসহ রাজধানীতে ফিরছিলেন তখন তিনি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। হঠাৎ তখন রাস্তার পাশে তাঁর চোখে পড়ল তরমুজের ক্ষেত। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে এর চেয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু আর কি আছে? রাজা তার অনুচরকে ক্ষেত থেকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট তরমুজ আনবার আদেশ দিলেন। যখন তারা তরমুজ আনতে গিয়েছে, কানে এলো হাসির শব্দ। সবাই তাকিয়ে দেখে—বটগাছের নীচে বসে আছে একটি মধ্যবয়স্ক অন্ধ লোক। রাজা সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি হাসছিলে কেন?" অন্ধ উত্তর দিলে—"আপনি ভালো তরমুজ আনবার আদেশ দিলেন, কিন্তু ক্ষেতে তো কোনো ভালো তরমুজ নেই। তাই আমার হাসি পেল।"

"তুমি তো অন্ধ। কি করে জানলে যে ক্ষেতে ভালো তরমুজ নেই?"

"মহারাজ, সব কিছু জানবার জন্যে চোখের দৃষ্টির দরকার হয় না। তরমুজের সময় চলে গেছে। ভালো ফলগুলি সব ঘরে নিয়ে গেছে। ক্ষেতে পড়ে রয়েছে পচা, শুকনোগুলি।"

ইতিমধ্যে অনুচররা তরমুজ ক্ষেত থেকে ফিরে এসে অন্ধের এই কথাগুলিই রাজাকে নিবেদন করল।

অন্ধের দূরদৃষ্টি বীরভদ্রকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করল। তিনি ভাবলেন—একে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া যাক। অনেক সমস্যার সমাধানে এই বিজ্ঞ অন্ধের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

অন্ধ সঞ্জয়কে রাজধানীতে এনে একটি ছোট ঘরে থাকতে দেওয়া হলো। তার আহার—রোজ দুই পাত্র চাল। সঞ্জয়ের দিন কাটতে থাকে। রাজধানীর কাছে, ছোট্ট ঘরে, দু'বেলা দু'মুঠো আহারে অতি সাধারণ তার জীবন-যাপন।

একদিন এক মণিকার রাজপ্রাসাদে বহু মূল্যবান মণিমুক্তো নিয়ে এলো বিক্রয় করার জন্যে। সভাসদরা উৎসাহের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ মণিমুক্তোগুলি কিনবার জন্যে পরামর্শ দিতে লাগলেন। মণিকার দেখল—এদের কেউই কিন্তু আসলের সঙ্গে নকল হীরের পার্থক্য বুঝতে পারছে না। সেই ব্যবসায়ী তখন হাতে একটি আসল একটি নকল হীরে নিয়ে বললে—"আসল হীরেটির দাম লাখ টাকা, এবং অন্যটি অল্প দামী কাঁচ কেটে বানানো। আপনাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান তিনি আসল হীরেটি বেছে নিন। যদি ভুল করে কেউ নকল হীরেটি আসল ভেবে তুলে নেন—তাহলেও তাকে আসলের দাম দিতে হবে, এই আমার শর্ত"—মণিকারের কথা শুনে সভাসদেরা চুপ। কেউ আর মূল্যবান পরামর্শ দিতে এগিয়ে এলেন না।

রাজা সব দেখে-শুনে বললেন—"সঞ্জয়কে খবর দাও। দেখা যাক আসল-নকলের পার্থক্য সে বুঝতে পারে কিনা।"

বিজ্ঞ মন্ত্রী-সভাসদেরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চাপা উপহাসের হাসি হাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অন্ধ সঞ্জয়! সে কি করে আসল আর নকল হীরের পার্থক্য বুঝতে পারবে?

ইতিমধ্যে সঞ্জয় এলে তাকে সব বলা হলো। সঞ্জয় সব শুনে

মণিকারকে বললো আসল ও নকল দুটো হীরেই তার হাতে তালুতে রাখতে। ব্যবসায়ী তাই করল। সঞ্জয় একটু এগিয়ে সূর্যের দিকে ধরে রইল খানিকক্ষণ সেই টুকরো দুটি। একটু পরে রাজার হাতে একটি টুকরো দিয়ে বলল—"মহারাজ, এইটিই আসল হীরে।"

অবাক বিস্ময়ে রত্ন-ব্যবসায়ী দেখলে—অন্ধ সঞ্জয় আসল হীরেটিকেই চিহ্নিত করেছে।

রত্ন-ব্যবসায়ীকে একলক্ষ টাকা দিয়ে বিদায় ক'রে রাজা জিজ্ঞেস করলেন সঞ্জয়কে—"তুমি অন্ধ হয়েও কি ক'রে আসল হীরেটিকে বেছে নিলে?"

"মহারাজ, সূর্যের আলোয় হীরে আর কাঁচকে রাখলে কাঁচ তাড়াতাড়ি গরম হ'য়ে যায়, কিন্তু হীরে হবে না।"

সঞ্জয়ের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজা তাকে দু'বেলার পরিবর্তে তিন বেলা আহার দেবার আদেশ দিলেন। অন্ধ সঞ্জয় আগের চেয়ে আর একটু সমাদরের সঙ্গে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন প্রভাতে রাজা বিচার-সভায় বসে আছেন। সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। তারা এসে রাজার কাছে মীমাংসার আবেদন জানাল। মৃত্যুর আগে তাদের পিতা সমস্ত সম্পত্তি তাদের দুই ভাইকে দিয়ে গেছেন। এই সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে কয়েক হাজার একর জমি। এই জমির মধ্যে যেমন রয়েছে উর্বর ভূমি, অন্যদিকে তেমনি ঝিল-জঙ্গল উষর পার্বত্য অঞ্চল। এই জমি সমান দু'ভাগে ভাগ করা কঠিন। কারণ ঝিল-জঙ্গল-নদী-পাহাড়ী অঞ্চল এসে সমস্ত ভাগ বাঁটোয়ারার অসুবিধে করে দেয়। তাই শেষ পর্যন্ত তারা রাজার কাছে এসেছে সুবিচারের আশায়। রাজার ভূমি বিভাগীয় মন্ত্রী ও কর্মচারীদের কাছে যখন সব খুলে বলা হলো—তারাও দেখলেন এদের জমি সমান দু ভাগে ভাগ করা অসম্ভব। রাজা বীরভদ্র সঞ্জয়কে খবর দিলেন।

বিজ্ঞ মন্ত্রীরা ভেবেই পেলেন না অন্ধ সঞ্জয় কি করে ঐ কঠিন

ভূসমস্যার সমাধান করবে—যখন চক্ষুষ্মান অভিজ্ঞ লোকেরাই এ ব্যাপারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ?

সঞ্জয় এসে সব শুনে স্মিত হাসিতে বললে—"মহারাজ, দুই ভাইয়ের এক ভাই সম্পত্তি ভাগ করুক, অন্য ভাই বেছে নিক কোন্ অংশ সে নেবে। আর, কে সম্পত্তি ভাগ করবে এবং কে তার ভাগ আগে বেছে নেবে সেটা লটারি করেই ঠিক করা হোক।"

দু' ভাই সানন্দে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল! তাদের কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে গেল।

—এই ভাবে অন্ধ সঞ্জয়ের দিন কাটে কঠিন সমস্যার সমাধানে রাজাকে সহায়তায়—প্রত্যহ তিন বেলার অতি পরিমিত আহারে, দীন কুটিরে।

একদিন এক অতি নির্জন অপরাহ্নের অবকাশে রাজা একাকী সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন—"সঞ্জয়, তুমি এমন বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী; কূট ও কঠিন সমস্যা তোমার ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে প্রাঞ্জল হ'য়ে যায়। দীর্ঘদিন নানা পরিস্থিতিতে তুমি আমার কাছে এসেছ। কিন্তু এটা কি আশ্চর্য নয় যে—তুমি কখনও বুঝতেই পার নি যে আমি রাজবংশের উত্তরাধিকারী হয়ে এই সিংহাসন পাই নি, অন্যায় ভাবে এই রাজ্য, রাজপ্রাসাদ অধিকার করে রাজা হয়ে রাজত্ব করছি?" শান্ত কণ্ঠে সঞ্জয় বলে—"মহারাজ, আমি প্রথম থেকেই তা জানতুম।"

"কি ভাবে?"—উৎসুক রাজা প্রশ্ন করেন।

"রাজবংশে যাঁর জন্ম তাঁকে যদি কেউ নানা কঠিন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে কখনও শুধু তিন বেলা আহার দিয়ে সাধারণভাবে নগর-উপান্তে পর্ণকুটিরে বাস করতে দেবার মতো অনুদারতা দেখাতেন না।" —অন্ধ সঞ্জয় উত্তর দেয়।



হিমাচলের এক চন্দ্রকমল

হিমাচল দেবভূমি। এর বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু পৌরাণিক উপাখ্যান। হিমপ্রদেশ আগে বিভক্ত ছিল বহু দেশীয় রাজ্যে। তাই কাহিনী কিংবদন্তীও সুপ্রচুর।

আধুনিক হিমাচলপ্রদেশের অন্যতম জেলা সির্‌মোর। হিমভূমির কেন্দ্রে শিবালিক পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এর অবস্থান।

সির্‌মোরি তাল কয়েক'শ বছর আগে ছিল সির্‌মোর-অঞ্চলের রাজধানী। এক সমৃদ্ধ নগর। সেই অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন এখন পর্যন্ত ভগ্নপ্রাসাদ-অট্টালিকার মধ্যে। আজ গিরিনদী তীরবর্তী এই সির্‌মোরি তাল-এ শিহরিত হয় অশরীরী আত্মার আর্ত হাহাকার।

হিমাচলপ্রদেশের অনেক জায়গায় নানা দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টরা ভিড় জমান। কিন্তু অতীতের স্মৃতি বিজড়িত এই জায়গাটিতে থাকবার ব্যবস্থা নেই বলে তারা কেউই সির্‌মোরি তাল-এ পা ফেলেন না। জায়গাটি জনপ্রিয় নয় ব'লে অনেকে এর নাম-ও শোনেন নি।

সির্‌মোরের এই নগরীর ধ্বংসের পশ্চাতে এক করুণ কাহিনী। অতীতের সেই রাজকীয় ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের দিনে এখানে রাজত্ব

করতেন এক সংগীত-কলানুরাগী রাজা। তার দরবারে ছিল বহু সুন্দরী নর্তকী। সবচেয়ে সুন্দরী নর্তকীর নাম চন্দ্রকমল। পূর্ণিমা চাঁদের স্নিগ্ধতা আর পদ্মফুলের সৌন্দর্য নিয়ে সে আলোকিত করত সিরমোরি রাজসভা। একদিন রাজার কি খেয়াল হলো চন্দ্রকমলকে নিয়ে নদী-বিহারে গেলেন তিনি। তারপর অনুচরদের ডেকে আদেশ দিলেন খুব লম্বা দড়ি আনতে। সেই দড়ি বেঁধে দেওয়া হলো নদীর এপার থেকে ওপারে—খুঁটির সঙ্গে টান টান করে। রাজা তারপর চন্দ্রকমলকে ডেকে বললেন—সে যদি এই দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত যেতে পারে তা হলে রাজা তাকে রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেবেন।

রাজার কথা শুনে চন্দ্রকমল দড়ির উপর দিয়ে নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত অবলীলাক্রমে হেঁটে গেল। দেখে বিস্ময়ে নীরব হয়ে গেলেন প্রাচীন সিরমোরের সেই নৃপতি। কৌতুকচ্ছলে উচ্চারিত অতি দুরূহ শর্তের বাস্তব পরিপূর্তি শিহরিত করল তার অন্তরকে। তখন তিনি সেই নর্তকীশ্রেষ্ঠাকে আবার এক কঠিনতর শর্ত দিলেন: চন্দ্রকমল যদি নদীর ওপার থেকে এপার পর্যন্ত দড়ির উপরে নাচতে নাচতে আবার ফিরে আসতে পারে তাহলে গোটা রাজ্যটাই রাজা দিয়ে দেবেন তাকে। চন্দ্রকমল চোখ বুজে শঙ্করজীকে স্মরণ ক'রে দড়িতে পা দিল, তারপর দুহাত উপরে তুলে নৃত্য-ভঙ্গিমায় পার হয়ে আসতে লাগল সেই নদী। বিস্ময়-স্তম্ভিত বাক্‌রুদ্ধ রাজা দেখলেন—চন্দ্রকমলের মৃণাল-তনু ছন্দ তুলে দড়ির উপর দিয়ে নদীর মাঝপথ পার হয়ে আসছে। তখনই সেই ক্রুর খেয়ালী রাজা কেটে দিলেন রজ্জুপ্রান্ত। তীব্র জলস্রোতে ভেসে গেল অসহায় কোমল-তরুণী চন্দ্রকমল। ভেসে যাবার আগে প্রতিশ্রুতি-হন্তা রাজার অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা দেখে তার চোখে জ্বলে উঠেছিল অভিশাপের আগুন। আর যে-মুহূর্তে রজ্জু দ্বিখণ্ডিত হয়ে চন্দ্রকমল ভেসে গেল তখনই সেই নদীর প্রচণ্ড জলপ্লাবন এসে আছড়ে পড়ল তীরে, শত-সহস্র ক্রুদ্ধ সাপিনীর

মতো সেই জলতরঙ্গ এগিয়ে চলল সামনের দিকে। সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন রাজা, তার পারিষদবর্গ, এমন কি—রাজার সাধের রাজ-অট্টালিকাও; রক্ষা পেল না রাজ-পরিবারের একটি বংশধরও যে-ভবিষ্যতে বসতে পারে সিংহাসনে। ফলে, পরবর্তীকালে রাজা জয়সলমেরের পুত্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সির্মোরের সিংহাসনে বসবার জন্যে।

…যদি সির্মোরি তাল-এ কেউ যান—সেই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন—চন্দ্রকমলের কঠিন অভিশাপ সেই ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে হা-হা করছে। সাধারণত কোনও লোক আজও সির্মোরি তাল-এ রাত কাটায় না। যে-দুঃসাহসী দু-একজন সির্মোরি তাল-এর ভগ্নস্তূপের মধ্যে নিশাযাপন করতে গিয়েছে—বিনিদ্র রজনীতে তারা ভগ্নপ্রাসাদ স্তূপের মধ্যে শুনতে পেয়েছে ঘুঙুরের বোল্, অদূরে প্রবাহিত গিরিনদীর ধবল বুকে শুক্লারজনীতে দেখতে পেয়েছে নৃত্যপরা অপরূপা নর্তকীকে, তাদের কানে এসেছে আকস্মিক জলোচ্ছ্বাস আর তার মাঝে নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার।…

হিমাচলের অসংখ্য ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এমন অনেক কাহিনী—অনেক কিংবদন্তী।



বাদশাহ কেকিলে ও ছুতোর মিস্ত্রী

অনেকদিন আগে আরবদেশে ছিলেন এক বাদশাহ্। তার নাম কেকিলে। তার ছিল গরমের দিনে থাকবার জন্যে সুন্দর একটি প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের চারদিকে ছ' ফুট উঁচু এক পাঁচিল বানাবার জন্যে তিনি এক কুশল রাজমিস্ত্রীকে আদেশ দিলেন। প্রাচীর বানানো শেষ হলে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বাদশাহ্ কেকিলে সেটি দেখতে গেলেন। পাঁচিল দেখে বাদশাহ্ গেলেন ভীষণ রেগে। রাজমিস্ত্রীকে তক্ষুনি ডেকে আনবার হুকুম দিয়ে বললেন—"ওর ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা এক্ষুনি নামিয়ে দাও।"

রাজমিস্ত্রী ছিল এক সুদর্শন তরুণ। বাদশাহের সামনে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কোনো রকমে সাহস যুগিয়ে সে বলল—"দুনিয়ার মালিক, পাঁচিলটা সত্যিই ভালো করে তোলা হয় নি, জায়গায় জায়গায় বেঁকে গেছে। কিন্তু শাহেনশাহ্, এর জন্যে আমি দায়ী নই। দয়া করে আমার কথা শুনুন।"

"ঠিক আছে, তোমার কি বলবার আছে বলো। কিন্তু এমন বিশ্রী পাঁচিল বানাবার জন্যে যে-দায়ী তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।"

"ধর্মাবতার আমি যখন পাঁচিলটা তুলছিলাম তখন ফুলওয়ালীর

সুন্দরী মেয়ে, কমলা বারবার আমার সামনে থেকে আসা যাওয়া করে আমায় আন্‌মনা করে দিচ্ছিল। তাই আমার কাজ খারাপ হয়েছে। এজন্যে কমলা দায়ী। তাকে ডেকে শাস্তি দিন।"

কমলাকে বাদশাহের সামনে আনা হলো। কমলা সত্যিই রূপ-লাবণ্যবতী সুন্দরী তরুণী। তার দুধে আলতায় মেশানো রঙ, টানা টানা চোখ আর তন্বী দেহবল্লরী দেখে প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন—বাদশাহ্ নিশ্চয়ই এই রূপবতী তরুণীকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু বাদশাহ্ ছিলেন খুবই রাগী প্রকৃতির। তিনি ঘোষণা করলেন—"ওহে মেয়ে, কাজ করবার সময় বারবার আসা-যাওয়া করে তুমি রাজমিস্ত্রীর মন উচাটন করেছিলে। সে জন্য তার কাজ খারাপ হয়েছে! পাঁচিল বেঁকে গেছে। তোমাকে রাজহাতীর পায়ের নীচে থেঁৎলে মরতে হবে।"

"হে মহানুভব বাদশাহ্", কমলা বাদশাহের পায়ে পড়ে করুণ কণ্ঠে বলল—"আমার কোনো অপরাধ নেই। সোনার চুড়ি আনবার জন্যে বারবার আমাকে স্বর্ণকারের কাছে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। সে কথা দিয়েও আমাকে বারংবার ঘোরাচ্ছিল, ঠিক পছন্দমতো চুড়ি বানাতে পারেনি। দায়ী তো সে।"

স্বর্ণকারকে ধরে আনা হলো। বাদশাহ্ বললেন—"ওহে স্বর্ণকার, আমার হাতী তোমার মোটা ভুঁড়ি দাঁত দিয়ে ফাঁসিয়ে দেবে। আমার গ্রীষ্মাবাসের পাঁচিল বেঁকে খারাপ হয়ে যাবার জন্যে তুমিই দায়ী। কমলাকে যদি তুমি ঠিক সময়ে তার পছন্দ মতো চুড়ি বানিয়ে দিতে তাহলে তাকে বারবার আর রাজমিস্ত্রীর সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হতো না আর ছোকরা রাজমিস্ত্রীরও হতো না মন উচাটন।"

"দয়ালু ধর্মাবতার, সব দোষ ছুতোর মিস্ত্রীর," হাঁফাতে হাঁফাতে ভুঁড়িওয়ালা স্বর্ণকার আবেদন জানাল, "আমি তাকে আমার বসবার টুলের ভাঙা পায়া সারাতে দিয়েছিলাম। সে ভাঙা পায়ার জায়গায় ছুটো বাজে নড়বড়ে পায়া লাগিয়ে দিয়েছে। সে টুলে বসে আমি ঠিকভাবে কাজ করতে পারছিলাম না, আমার হাত নড়ে যাচ্ছিল।

তাই তো ঠিক সময়ে আমি কমলার পছন্দমতো চুড়ি বানিয়ে দিতে পারি নি। ব্যাটা ছুতোরই দোষী। তাকে শাস্তি দিন, শাহানশাহ্।"

ছুতোর মিস্ত্রী বাদশাহের সামনে এসে দাঁড়াল। শীর্ণ তীক্ষ্ণ চক্ষু মিস্ত্রীর বুকের প্রতিটি হাড় স্পষ্ট গোনা যাচ্ছিল। শরীরে তার হাড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

"রাজহাতী তোমাকে তার ধারালো দাঁত দিয়ে চিরে মারবে তুমি জান—আমার গ্রীষ্মাবাসের প্রাচীর বেঁকে বাজে হয়ে গেছে, কারণ যুবক রাজমিস্ত্রী কাজ করার সময় সুন্দরী কমলা তার মন বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে বারবার তার সামনে থেকে স্বর্ণকারের বাড়িতে আসা যাওয়া করে; স্বর্ণকার কমলার পছন্দ মতো চুড়ি ঠিক সময়ে বানাতে পারে নি, কারণ তার বসবার টুলের পায়া তুমি ঠিক ভাবে লাগিয়ে দাওনি, ভালোভাবে টুলের উপর বসে সে কাজ করতে পারে নি। তুমিই আসল অপরাধী। এখন মরবার আগে তোমার শেষ ইচ্ছা জানাতে পার আমি মঞ্জুর করব।"

"সদাশয় মহানুভব বাদশাহ্, আপনার এই দয়ার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ," অত্যন্ত বিনীত ভাবে মিস্ত্রী বলতে লাগল, "কিন্তু প্রভু, আপনার রাজহাতীর দাঁত খারাপ হয়ে যায়—এমন কোনো কাজ আমি করতে দিতে পারি না। আমার এই শরীর তো দেখছেন—শুধু হাড়ে ভর্তি। এর মধ্যে মাননীয় রাজহাতীর দাঁত ঢুকবে না, বরং এই শক্ত হাড়ে লেগে মূল্যবান হাতীর দাঁতই ঘায়েল হয়ে খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে বরং ভালোভাবে খেয়ে দেয়ে মোটা হতে দিন। বেশ কিছুদিন পরে ভালো খেয়ে শরীরে যখন আমার মেদ আর চর্বি জমে স্বর্ণকারের মতো গোল ভুঁড়ি দেখা দেবে—তখন আপনার হাতী সহজেই তার দাঁত আমার শরীরে ঢুকিয়ে মনের সুখে আমাকে মেরে ফেলতে পারবে।"

ছুতোর মিস্ত্রী কি সত্যিই কি কোনোদিন তেমন মোটা হতে পেরেছিল মেদ আর ভুঁড়ি নিয়ে?



চন্দ্রানদীর পারে

দেবভূমি হিমাচলের সবচেয়ে উঁচু জেলা লাহুল-স্পিতি তের থেকে কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে।

চন্দ্রানদীর উপরে যে সমতলভূমি সেখানেই লাহুল উপত্যকার শিশুগ্রাম। সারা বছর ভারী বরফের পোশাক পরে থাকার পরে জুনমাসে শিশুর গায়ে দেখা যায় সবুজ রঙের আবরণ।

সে বছর জুন মাসেও হঠাৎ ভারী বরফপাত হলো শিশুতে। ডিসেম্বরের মতো সারা জায়গায় শুধু বরফ আর বরফ। লোকেদের মন খুব খারাপ। যে-সব ছোট বার্লিগাছ মাথা তুলেছিল—সব মারা গেল। দেখা দিল খাবারের অভাব। বৌদ্ধ পুরোহিত লামারা এসে 'তন মন' মন্ত্র পড়ে পাহাড়ের দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন। কিন্তু আবহাওয়ার কোনো উন্নতি হলো না। তখন শিশুর লোকেরা উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় গেকান দেবতার মন্দিরে পুজো দিল ছাগ বলি দিয়ে, তার উষ্ণ হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করল লাহুল দেবতার উদ্দেশে।

কিন্তু শিশুর অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। তখন গোন্ধলার 'গুর'-কে (যার উপর দেবতার ভর হয় এবং যার মাধ্যমে দেবতার নির্দেশ পাওয়া যায়) ডাকা হলো।

তারা মন্দিরে গিয়ে গুরের মাধ্যমে দেবতাকে প্রশ্ন করল "হে পাহাড়ের দেবতা, তুমি আমাদের কেন এত কষ্ট দিচ্ছ? আমরা কি অপরাধ করেছি?"

গুরের মাধ্যমে দেবতা উত্তর দিলেন—"তোমরা খুব অহঙ্কারী হয়ে উঠেছ। তোমাদের মধ্যে সেই আন্তরিক আতিথেয়তা আর নেই যা প্রতিটি মানুষের ধর্ম। শিলা-শিখরের স্পিতি-দেবতা কিউলিং তোমাদের উপর রেগে গেছেন। কারণ তাদের মন্দিরের পুরোহিতকে তোমরা কোনো আদরযত্ন তো করই নি, বরং কটু কথা বলে বিদায় করেছ যখন সে কারদাং গোম্ফায় যাবার পথে তোমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। দেবতারা যতক্ষণ অসন্তুষ্ট থাকবেন তোমাদের ক্ষেতে ফসল ফলবে না, দুগ্ধবতী হবে না পশুর বাঁট।"—এ কথা শুনে যেন ডিসেম্বরের তুষার-ঝড় বয়ে গেল পাহাড়ী মানুষের শিরদাঁড়া বেয়ে?

বৃদ্ধরা বলতে লাগলেন—"আমরা খুব অপরাধ করেছি এবং সে-জন্য অনুতপ্ত। এখন আমাদের বাঁচার পথ বাৎলে দাও। যদি আর একটি ফসলের দানাও নষ্ট হয়—আমাদের বাচ্চারা শীতকালে না-খেয়ে মারা যাবে।"

"কিন্তু কি করে তোমরা রুষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করবে? তোমরা কি ভেবেছ কিউলিং দেবতা তোমাদের ঐ ছোট্ট ছাগল বা আধ পেটা ইয়াক বলিতে খুশী হবেন?"

"তা হলে কি হবে?"—গ্রাম-বৃদ্ধরা সবাই একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

তখন গুরের মাধ্যমে দেবতা নির্দেশ দিলেন—"ছাগল বা ইয়াক বলি দিলে হবে না। একমাত্র মানুষের রক্তই ক্ষুব্ধ দেবতার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে।"

কি আর করবে অসহায় পাহাড়ী মানুষেরা? তারা চম্বা লাহুলে লোক পাঠাল বলির মানুষ কিনে আনতে। কিন্তু কেউই রাজী হলো

না তাদের জন্যে মানুষ বেচতে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ, হতাশ মানুষগুলি অবশেষে সব আশা ত্যাগ করে চম্বা রাজার কাছে গিয়ে তাদের দুর্ভাগ্য ও সমস্যার কথা খুলে বলল। রাজা তার মন্ত্রীকে ডেকে লাহুলের মানুষদের সাহায্য করতে বললেন। শেষ পর্যন্ত চম্বার লোকেরা এক পাটা সোনার বিনিময়ে লোয়ালাই নামে মাতা-পিতা হীন এক অনাথা মেয়েকে তাদের হাতে সঁপে দিল। লোয়ালাই ভিতরের আসল কথা কিছুই জানত না। সে বরং পেট ভরে দুবেলা খেতে পাবার আশায় খুশী মনে শিশু গ্রামে চলল। লাহুলের লোকেদের মিষ্ট ব্যবহার এবং গরম কাপড়-চোপড়-পাথরের মালা ও নানারকম খাবার-দাবার, ছাতু, বার্লি-পিঠে থুক্‌পার কথা ভেবে তার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

গাঁয়ের মুখিয়া (প্রধান) শেয়াং-এর বাড়িতে লোয়ালাইকে থাকতে দেওয়া হলো। তার সুন্দর নম্র ব্যবহারের জন্যে সবাই তাকে ভালোবেসে ফেলল। শেয়াং তাকে দেখত নিজের মেয়ের মতো। কিন্তু তারপর একসময় বলির দিন কাছাকাছি এসে গেল।

সেই সময় একদিন শিশু-গাঁয়ের বাচ্চাদের সঙ্গে যখন খেলছিল একটি ছেলে লোয়ালাইকে বলল—"মনের সুখে আজ যত পারিস খেয়ে নে। তোকে তো কালই দেবতা কিউলিংয়ের মন্দিরে বলি দেওয়া হবে।"

"না—না—আমি না, এ হতেই পারে না—" লোয়ালাই চীৎকার করে বলে ওঠে।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুইই। গতকাল রাতে আমি বাবাকে বলতে শুনেছি মুখিয়ার কাছে। কিউলিং দেবতাকে খুশী করার জন্যে তোকে বলি দিতেই হবে। তাই তো তোকে আদরযত্ন করে নিয়ে এসেছে চম্বা থেকে।"

লোয়ালাই ঝোড়ো বাতাসের মতো উড়ে গিয়ে শেয়াংকে জিজ্ঞেস করল—"বাবা, কাল তোমরা আমাকে দেবতার সামনে বলি দেবে?"

শেয়াং-এর গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামল। মুখে তাকে আর কোনো কথা বলতে হলো না। লোরালাই সব বুঝে গেল।

পরের দিন মহাসমারোহে বলির আয়োজন হলো। ঘড়া ঘড়া ছ্যাং (লাহুল-স্পিতির লোকেদের প্রিয় পানীয়) এলো। সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে সবাই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। তারপর এক সময় পুরোহিত লোরালাইকে নিয়ে পূজা-অঙ্গনে এলো। লোরালাইয়ের মুখে ভয়ের চিহ্নও নেই। মরে যাবার আগে সে শুধু তার শেষ ইচ্ছা জানাল : সে শেষবারের মতো পবিত্র চন্দ্রানদীতে একবার ডুব দিতে চায়। লোরালাইয়ের এই শেষ ইচ্ছায় পুরোহিত বাধা দিল না।

চন্দ্রানদীর একটু উপরে একখানি পাথরের উপর বসে লোরালাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল—"হে মা মহাদেবী হিড়িম্বা, তুমিই একমাত্র ভরসা কুলু আর চম্বার মানুষদের। তোমার করুণা না পেলে এই বিচিত্র দেশে আমি মারা যাব। মা, আমায় বাঁচাও, বাঁচাও।"

তারপর পাহাড়ের উপর থেকে নেমে চন্দ্রানদীর দিকে যখন লোরালাই যাচ্ছিল—কোত্থেকে মেটে রঙের একটা গরু এসে হাজির। লোরালাই গরুর লেজ ধরে চন্দ্রানদীর দিকে নামতে লাগল। বরফ-ঠাণ্ডা চন্দ্রানদীর জলে তীব্র স্রোত—সেখানে পা দিলে আর বাঁচবার উপায় নেই। কিন্তু তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। গরুটি নদীর পারে যাওয়ামাত্র সেই মৃত্যুশীতল স্রোত হয়ে গেল শান্ত-স্নিগ্ধ এক হ্রদের মতো, আর গরুটি অবলীলায় সেটি পার হয়ে গেল, পেছনে তার লেজ ধরে ঝুলে থাকা লোরালাইকে নিয়ে। আর তখনই পাহাড়ের উপরের পাইনের বন থেকে নেমে এলো সবুজ পরীর দল, তারা লোরালাইয়ের হাত ধরে উড়ে গেল দূর পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে।

কিন্তু শিশুর লোকেদের কি হবে? তাদের দুর্ভাগ্যের তো শেষ হয়নি। তারা গেফান দেবতার কাছে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ে রইল—

যতক্ষণ পর্যন্ত না দেবতার দয়া হয় তারা মন্দির ছেড়ে যাবে না। অবশেষে দেবতার দয়া হলো। তাঁরই তো দায়িত্ব এই সব লোকের শুভাশুভ দেখবার। লাহুলের গেফান দেবতা স্পিতির কিউলিং দেবতার সঙ্গে কথা বলে একটা রফা করলেন। শিশুর লোকেরা স্পিতিতে কিউলিং দেবতার মন্দিরে একুশটি ভেড়া, এগারটি ছাগল এবং একটি ইয়াক বলি দিল। দেবতা এবার সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ক্ষমা করলেন। আবার শিশু গ্রামের উপত্যকা-অঙ্গন ভরে উঠল সবুজ শস্য ও ফল-ফুলে।

কিন্তু মহাদেবী হিড়িম্বা চম্বার রাজাকে কোনোদিন ক্ষমা করে নি। অসহায় অনাথা লোরালাইকে নিষ্ঠুরভাবে লাহুলের লোকেদের কাছে বিক্রি ক'রে দেবার জন্যে। একদিন রাজা যখন দরবারে বসে বিচার করছিলেন সহসা তার উপর অভিশাপ নেমে এসেছিল বজ্রপাতের মধ্যে। তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন ; আর তার মধ্যস্থতাকারী মন্ত্রী যখন একদিন বনের ধারে বেড়াচ্ছিলেন মেটে রঙের একটা বিরাট ভালুক এসে তাকে মুখে তুলে নিয়ে গেল ঘন জঙ্গলের মধ্যে। কোনোদিন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।



হাওয়ায় বিষের শব্দ

গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করার পর দু'শ বছর পরে তিব্বতে একজন ধার্মিক রাজার জন্ম হয়েছিল। তার নাম গিয়াপো ঠিরালপাচাম। তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী তিনি মাথায় লম্বা চুল রাখতেন। সেকালে শুধু লামারাই চুল ছাঁটাতেন ছোট ক'রে। রাজা এতই ধর্ম-প্রবণ ছিলেন যে গুরু এলে তিনি তাঁর লম্বা চুল বিছিয়ে দিতেন গুরুকে বসবার জন্যে। তারপর ধর্মালোচনায় তাঁর সময় কেটে যেত। যখন গিয়াপো এইভাবে একদিন ধর্মালোচনায় মগ্ন তখন তাঁর ছোটভাই লংদর্মা এসে এক কোপে তাঁর মাথা কেটে ফেলল। রাজ্যের লোকেরা বিশেষ করে মঠের সন্ন্যাসীরা এই ঘৃণ্য পাশবিক কাজের খুব নিন্দা করলেন। যাই হোক, রাজা হয়ে সিংহাসনে বসল লংদর্মা।

রাজা লংদর্মাও লম্বা চুল রাখত। কিন্তু তার একটি বিশেষ গোপন কারণও ছিল। তার মাথায় ছিল একজোড়া শিং। সেই শিং সে লম্বা চুলের তলায় লুকিয়ে রাখত। প্রত্যেক দিন রাজপ্রাসাদে একটি মেয়ে আসত রাজার কেশসজ্জার জন্যে। কিন্তু যাতে সেই মেয়েটি বাইরে গিয়ে রাজার শিংয়ের কথা কাউকে বলতে না-পারে সেইজন্যে

সন্ধ্যেয় লংদর্মা সেই মেয়েটিকে মেরে ফেলত। পরের দিন কেশসজ্জার জন্যে আসত আবার কোনো নতুন মেয়ে। রাজ্যের লোকেরা কিন্তু জানত না কেন লংদর্মা কেশসজ্জাকারিণী মেয়েদের রোজ মেরে ফেলে। তারা রাজার উপর অসন্তুষ্ট হতে লাগল। এরপর রাজা লংদর্মা আবার বৌদ্ধধর্মের উদার আবহাওয়ার পরিবর্তে পুরানো সংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ বিধির প্রচলন করতে শুরু করল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর শুরু হলো নানা উৎপীড়ন।

রাজার চুল সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দেবার জন্যে সেদিন ডিচেন ওয়াংমো নামে একটি নতুন মেয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়েছে। পেছনে দাঁড়িয়ে রাজার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার চোখ জলে ভরে গেল—আজ সন্ধ্যেতেই তার এই আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা ভরা তরুণী জীবনের সমাপ্তি। লংদর্মা'র কাঁধের উপর পড়ল তার গাল-থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রু। রাজা পেছনে ফিরে ওয়াংমোর দিকে তাকিয়ে তার কান্নার কারণ জানতে চাইল। ওয়াংমো তার মন্দ ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করল—এই অতি অল্প বয়সেই বিনাদোষে তার কুমারী জীবনের আজ শেষ দিন। নিরপরাধ অসহায় মেয়েটির কথা শুনে হঠাৎ আজ দয়া হলো লংদর্মার মনে। বলল—"ঠিক আছে। আমি তোমাকে হত্যা করব না। কিন্তু খবর্দার, আমার মাথায় শিংয়ের কথা কাউকে কিছু বোলো না। কেউ যেন এর বিন্দু-বিসর্গ জানতে না পারে।"—শপথ ক'রে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলো ওয়াংমো।

দিন কেটে যায়। রাজার মাথার শিংয়ের অদ্ভুত ব্যাপারটা অন্তত একজন কাউকে বলবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে ওয়াংমোর মন। এমন একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের ব্যাপার কাউকে বলতে না-পেরে আহারে রুচি নেই ওয়াংমোর, চোখে নেই ঘুম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে—রাজা লংদর্মার কাছে প্রতিজ্ঞার কথা। কাউকে সে-কথা বললে

তার ঘাড়ে মাথা থাকবে না। তবু থেকে থেকে রাজার দু' শিংয়ের অদ্ভুত দৃশ্য মনের মধ্যে উথলে ওঠে। নাওয়া-খাওয়া-ঘুম একেবারেই বন্ধ হবার উপক্রম ওয়াংমোর। একা একা এক কিম্ভূত কথার রহস্য বয়ে দিনে দিনে সে শুকিয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন আর থাকতে না-পেরে মরিয়া হয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের কাছে রাজা লংদর্মার মাথায় শিংয়ের কথা ফিস্‌ফিস্ করে বলে ওয়াংমো আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিল সেই গোপন কথা। কিছুদিন পরে সেখানে গজিয়ে উঠল লম্বা সবুজ ঘাস। হাওয়ায় দুলে দুলে সেই ঘাসগুলি বলতে লাগল—"রাজার মাথায় শিং। শিংওয়ালা রাজা।"—লংদর্মার গোপন কথা বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তিব্বতের প্রজাদের মধ্যে।

লামারা আগে থাকতেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন লংদর্মার ব্যবহারে, তার মাথায় শিংয়ের কথা শুনে এবারে তাঁরা তাকে হত্যা করবার মনস্থ করলেন। কিন্তু বৌদ্ধদের পক্ষে জীবহত্যা পাপ, বিশেষ ক'রে রাজাকে। অবশেষে অনেক ক্লিষ্ট চিন্তার পরে লামারা ঠিক করলেন—তাঁরা লটারি করবেন। লটারিতে যার নাম উঠবে—তার উপরেই দেওয়া হবে লংদর্মাকে মেরে ফেলার কঠিন কাজের ভার।

লটারিতে লামা দোর্‌জের নাম উঠল। দোর্‌জে নির্জনে গিয়ে প্রার্থনার পরে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগল। বর্শা ও তীর ছোঁড়ায় সে দক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। দোর্‌জে একদিন এত জোরে বর্শা ছুঁড়ল যে একটা পাথরে লাগায় সেটা বিদীর্ণ হয়ে গেল। এই বিদীর্ণ পাথরটিকে এখনও দেখা যায় তিব্বতের সেরা-নামে গোম্ফায়। 'দোর্‌জে' শব্দের অর্থ 'বজ্র'। সার্থক হলো দোর্‌জের নাম।

লামারা ঠিক করলেন—অত্যাচারী ও সন্দেহপরায়ণ রাজাকে কোনো ছুতোয় একটি বিশেষ জায়গায় এনে হত্যা করা হবে। তাঁরা একটি নৃত্য-উৎসবের আয়োজন করলেন। লম্বা গাউন, ঝোলা হাতার

পোশাক পরে নাচবেন বলে লামারা ঠিক করলেন—যাতে এই পোশাকের মধ্যে তীর-ধনুক লুকিয়ে রাখা যায়। অনেকদিন ধরে এই নাচ-গান চলল। দলে দলে লোকেরা এসে ভিড় করতে লাগল নাচ দেখবার জন্যে। তারপর শেষদিনে রাজা লংদর্মা এসে বসল সভা-পতির আসনে। লামারা প্রথমে ধীর লয়ে নাচ শুরু করলেন। তার-পর নৃত্যগীত যখন ক্রমশ দ্রুতলয়ের দিকে তখন দোর্‌জে পোশাকের মধ্যে লুকানো তীর ছুঁড়ে লংদর্মাকে মেরে ফেলল।

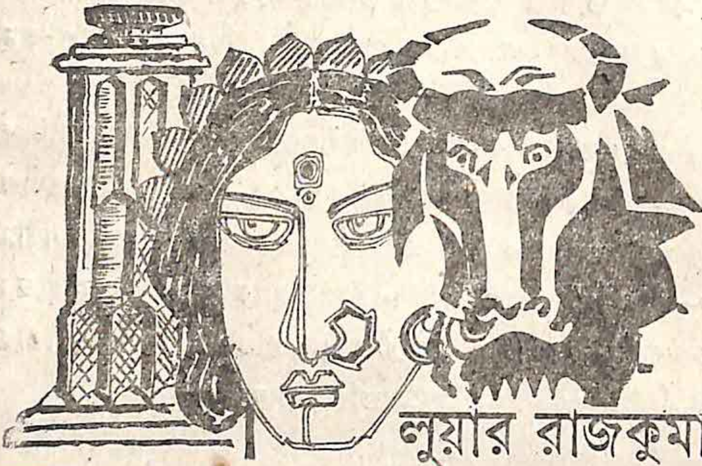
পালাবার ব্যবস্থা আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। রাজাকে মারবার পরে দোর্‌জে দৌড়ে গেল কিচ্ছু নদীর পারে সেখানে একটি সাদা ঘোড়াকে রাখা হয়েছিল পুরোপুরি কালো রঙে ছুপিয়ে। নদীতে সাঁতার দিয়ে ঘোড়াটি দোর্‌জেকে পিঠে নিয়ে যখন অপর পারে উঠল, তখন কালো রঙের ঘোড়া হয়ে গেল সাদা। দোর্‌জের বাইরের নাচের পোশাকটি নদীতে ফেলে দেওয়া হলো। নদী পার হয়ে একটি গুহার মধ্যে গিয়ে ধ্যানীর ভঙ্গীতে বসে রইল দোর্‌জে। কতকগুলি পাখী তার মাথায় ফেলে দিল খড়কুটো ধুলোবালি—মনে হলো যেন অনেক দিন ধরে সে সমাধিস্থ।

রাজার রক্ষীরা পেছনে পেছনে ছুটে আসছিল। তারা গুহার মধ্যে এসে নিমীলিত আঁখি দোর্‌জেকে দেখতে পেল পদ্মাসনে। রক্ষীদের মধ্যে একজন কিন্তু এই বাইরের রূপে না-ভুলে দোর্‌জের একখানি হাত নিয়ে তার নাড়ীর গতি দেখল—স্পন্দন দ্রুত। তারা বুঝতে পারল—এই লোকটিই হত্যাকারী। রক্ষীটি বললে—"এই ব্যক্তির নাড়ীর গতিই জানিয়ে দিচ্ছে যে সে হত্যাকারী।" তারপর তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল: রাজা লংদর্মা ছিল অত্যাচারী, অস্বাভাবিক। সে এখন মারা গেছে। তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে কি লাভ? —এই বলে তারা চ'লে গেল। ধরা পড়েও বেঁচে গেল দোর্‌জে।

এরপর থেকে বৌদ্ধ লামাদের মধ্যে নৃত্য একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানে

দাঁড়িয়ে গেল। লোকেরা পালন করতে লাগল অত্যাচারী রাজার মৃত্যু-উৎসব। তারপর এই অনুষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়াল—সব অত্যাচারী মানুষের মৃত্যু-উৎসব প্রতীক, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়।

হিমাচলের লাহুল-স্পিতির বৌদ্ধ লামারা জুন-জুলাই মাসে নিজ নিজ গোম্ফায় বার্ষিক নৃত্য-উৎসব পালন করেন হিংস্র জন্তুর মুখোশ পরে নানা নৃত্য-ভঙ্গিমায়। হিংস্র জন্তুদের মুখোশ হলো অত্যাচারীর প্রতীক—যারা সব সময়ে শুভ শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। বর্তমানে এই নৃত্য-উৎসবের উদ্দেশ্য অপদেবতা, শয়তান বা দুষ্ট আত্মার বিতাড়ন। এই নৃত্যকে বলা হয়, 'ডেভিল ডান্স'।



লুয়ার রাজকুমারী

ইন্দোনেশিয়ার ওয়াজো জেলার লোকেরা গায়ে সাদা দাগওয়ালা এলবিনো মোষের মাংস খায় না। যদিও অন্য জাতের মোষের মাংস খেতে তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু সাদা দাগওয়ালা মোষের মাংস তারা খাবে না।

ওয়াজো জেলার প্রধান শহর সেঙ্গকেঙ্গ। সেঙ্গকেঙ্গ শহরের একজন ইন্দোনেশিয়ান এ-সম্বন্ধে প্রচলিত একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেন। গল্পটি প্রাচীন কালের এক রাজকুমারীর।

লুয়া রাজ্যের রাজা ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। প্রজারা তাকে খুব ভালোবাসত। রাজার কোনো ছেলে ছিল না। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজার একমাত্র মেয়ে। সেই রাজকুমারীকে নিয়ে কেবল রাজা নয়, প্রজাদেরও দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। কারণ রাজকন্যার ছিল এক অদ্ভুত ধরনের চর্মরোগ। রাজ্যের সব প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করেও রাজকুমারীর রোগ ভালো করতে পারেন নি। আস্তে আস্তে লাল-লাল গোলাকার দাগে তার সারা দেহ ভরে যেতে লাগল।

রাজা-রাণী এবং রাজপ্রাসাদের সব লোক রাজকুমারীর দেহে এই রোগ দেখে খুব বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। প্রজাদেরও চিন্তা হলো—রাজকুমারীর দেহ থেকে এই দুরারোগ্য ব্যাধি যদি তাদের শরীরেও ছেয়ে যায়?

প্রজাদের ভয় দিনে দিনে বাড়তে থাকে। কি করে এই বিষম ব্যাধি থেকে রেহাই পাওয়া যায় তারা সর্বদা সেই চিন্তা করতে লাগল। রাজকন্যাকে তো আর মেরে ফেলা যাবে না। রাজবংশের রক্তপাত নিষিদ্ধ। তবে জীবন্ত রাজকন্যাকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু রাজা যদি তাতে রাজী না-হন? প্রজারা ভেবে ঠিক করল যে তাহলে তারাই এ-রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে বাস করবে।

প্রজাদের মধ্যে এই আন্দোলনের কথা রাজা জানতেন। তাই একদিন যখন প্রধানমন্ত্রী তাঁর সামনে এক আবেদন নিয়ে হাজির হলেন তিনি বিস্মিত হলেন না। প্রধানমন্ত্রী বললেন—"মহারাজা, আপনি মাত্র একজনের ভালো চান অথবা বহুলোকের মঙ্গল?"

রাজা জবাব দিলেন—"বহুজনের মঙ্গল।"

রাজার জবাব শুনে প্রধানমন্ত্রী খুব বড় একটা জাহাজ বানাবার আদেশ দিলেন। জাহাজে এক বছরের মতো আহার ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। রাজকন্যাকে তুলে দেওয়া হলো সেই জাহাজে। রাজকুমারীর পরিচারিকা এবং যারা তাকে খুব ভালোবাসত এমন আরো কয়েকজন স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে জাহাজে উঠলো। চরম বিপদের দিনেও তারা রাজকন্যার সঙ্গ ছাড়ল না।

জাহাজ ওলানিয়া নদীর জলে ভেসে ভেসে এগিয়ে চলল। তার পর অনেক দিন পরে এসে ঠেকল গাছপালা ঘেরা নির্জন এক জায়গায়। সেখানে নদীর ধারে ছিল ওষো গাছের সারি।

রাজকুমারী এবং তার লোকেরা সেই শস্য শ্যামলা জায়গাটিতে বাস করার সিদ্ধান্ত নিল। সেখানে নেমে পরিচারকরা গাছ কেটে

পরিষ্কার করে সেখানটিকে বাসযোগ্য করে তুলতে লাগল, আর একটি বাড়ি বানাল সুবিধে মতো জায়গায়। পরিচারিকারা শস্যের বীজ বুনল মাঠে, চারিদিকে নানারকম গাছের চারা লাগাতে লাগল। আস্তে আস্তে সেখানকার উর্বর জমি নানা ফসলে ভরে উঠল।

অদ্ভুত চর্মরোগ নিয়ে রাজকুমারী একা বাড়িতে বসে খাবার-দাবারের তদ্‌বির করে। একদিন ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের ফসলের ক্ষেতের দিকে সে তাকিয়েছিল। দেখল গায়ে সাদা দাগ একটি মোষ তাদের কাঠের বাড়ির দিকে আসছে। রাজকুমারী শব্দ করে মোষটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মোষটা দরজা ঠেলে রাজকুমারী যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই ঘরে ঢুকে পড়ল। মোষটার নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে গরম নিঃশ্বাস বার হচ্ছিল। রাজকুমারী জ্ঞান হারিয়ে সেখানে পড়ে গেল। মোষটা তখন তার লম্বা জিভ দিয়ে চাটতে লাগল সংজ্ঞাহীন রাজকন্যার দেহ। চুল, মুখ, হাত পায়ে অনেকক্ষণ চেটে মোষটা আবার জঙ্গলে ফিরে গেল।

জ্ঞান ফিরে এলে রাজকুমারী দেখল—তার সারা শরীরে মোষের জিভের লালা। সে দৌড়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে ধুরে ধুয়ে পরিষ্কার করল সে সারা শরীর।

নদীর জলে স্নান সেরে রাজকুমারী যখন নিজের দিকে তাকাল, দেখল তার চামড়ার উপরের লাল দাগ অনেক মিলিয়ে গেছে। আনন্দে তার চোখে জল এলো। ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানাল সে।

পরিচারক-পরিচারিকারা ঘরে ফিরে এসে রাজকুমারীর চর্মরোগের পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পরের দিন সবাই মাঠে কাজে গেলে আবার সেই মোষটি রাজকুমারীর কাছে এসে হাজির। সেদিন সে রাজকুমারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে চেটে দিল। এইভাবে সাদা দাগওয়ালা মোষটা পরপর কয়েকদিন আসতে লাগল। সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল

রাজকন্যার দুরারোগ্য চর্মরোগ। তারপর মোষটি আর কোনোদিন আসেনি।

রাজকুমারীরা যেখানে বাস করত আস্তে আস্তে সে-জায়গাটি ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। নানা জায়গা থেকে লোকেরা এসে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান ও বাস করতে শুরু করল। ফলে ওলানিয়া নদীর তীরে জায়গাটি হয়ে উঠল রাজকুমারীকে ঘিরে একটি ছোট রাজধানী শহর। সেই নতুন রাজধানীর রাজাহীন রাণী হয়ে বসলেন সেই রাজকুমারী।

এই নতুন শহরটি ছিল বোনে নামক রাজ্যের পাশে। কিন্তু বোনের লোকেরা কখনও সেখানে আসেনি। বোনের রাজকুমার ছিল আরু মালোলো। আরু মালোলো একদিন শিকারে এসে তার সঙ্গীসহ ওলানিয়া নদীর ধারে গভীর জঙ্গলে রাস্তা হারিয়ে ফেলল। অনেক চেষ্টা করেও কোনো জনবসতির খোঁজ পেল না তারা। তাদের খাবারও ফুরিয়ে গিয়েছিল। ফলে ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে তারা কাতর। খুঁজতে খুঁজতে রাজকুমারের কয়েকজন সঙ্গী অবশেষে রাজকুমারীর প্রাসাদ দেখতে পেল। তারা সেখানে এসে রাজ-কুমারীকে জানাল যে রাস্তা হারিয়ে তাদের রাজকুমার কয়েকদিন ধরে ক্ষুধা-ক্লান্তিতে অবসন্ন। রাজকুমারী তাদের ক্ষুধার আহার ও তৃষ্ণার জল দিল। যাবার সময় নানারকম খাবারের একটি থালা সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে সে বলল—“এই খাবারের থালাটি তোমাদের রাজকুমারকে দিয়ো। আমার আর কিছু দেবার নেই। লুয়া রাজ্যের লোকের কাছ থেকে তোমাদের রাজপুত্রকে এই ছোট্ট একটি উপহার। ভগবান তোমাদের ভাল রাখুন।”

আরু মালোলোর সঙ্গীরা রাজকন্যার আসল পরিচয় জানতে পারে নি। কিন্তু রাজপুত্র যখন সেই আহার দ্রব্যের উপহার পেল তখন সেই খাদ্য দ্রব্যের সাজাবার ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারল রাজবংশের কোনো মেয়ে এটি পাঠিয়েছে। আরু মালোলো তখনই সঙ্গীদের নিয়ে

সেই রাজকন্যার কাছে গেল। রাজকুমারীকে দেখে তার খুব ভালো লেগে গেল। সে বিয়ে করল তাকে। আর মালোলোর রাজ্যের সঙ্গে রাজকন্যার অঞ্চল যুক্ত হয়ে তাদের আরও সমৃদ্ধি হলো।

এই জায়গাটির নামই আজ ওয়াজো জেলা এবং তার প্রধান শহর সেঙ্গকেঙ্গ। এখানকার লোকেরা সাদা দাগওয়ালা মোষের মাংস খায় না। কারণ সাদা দাগওয়ালা এলবিনো মোষই তো তার জিভ দিয়ে চেটে চেটে রাজকুমারীর দুরারোগ্য চর্মরোগ ভালো করে দিয়েছিল।



লাহুলের ভূতিনী

হিমাচলের লাহুল-স্পিতির লোকেরা ভূত-পেত্নী-অপদেবতায় খুব বিশ্বাস করে। এই নিয়ে অনেক গল্প ওদের মধ্যে শোনা যায়। বর্তমান কাহিনীটি এক পেত্নীর। পেত্নীকে ওরা বলে যোগিনী।

লাহুলে তান্দি নামে একটা খুব সুন্দর জায়গা আছে। তান্দির উপরে কার্‌গা ময়দানে প্রতি বছর মার্চ মাসে পেত্নীদের এক মেলা বসে।

কার্‌গা ময়দানের মেলায় নানা জায়গা থেকে যোগিনীরা উড়ে এসে জমা হয়। মেলার নিয়ম হলো—প্রত্যেক যোগিনীকে একটা করে জন্তু—ছাগল, ভেড়া, মোষ বা ইয়াক (চমরী গাই) নিয়ে আসতে হবে। তারপর মেলায় বসবে বিরাট ভোজের আসর।

এই যোগিনীদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা আর সব মানুষদের মতো মানুষের বেশে ঘর-সংসার করে। শুধু কার্‌গা মেলার সময় রাতে কোনো গাছের উপর চড়ে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে শূন্য থেকে উড়ে আসে।

সেই যোগিনীর বাড়ি ছিল কিন্নর জেলার খোকসারে। সেবার সে

কিছুতেই দুটো ইয়াক যোগাড় করতে পারল না। সারাদিন এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি না-করে শেষে সে ঠিক করল যে তার নিজের গোয়ালের ইয়াক দুটো নিয়েই কার্‌গা মেলায় রওনা দেবে।

সে যখন ইয়াক দুটো নিয়ে কার্‌গা মেলায় যাবার উদ্যোগ করছে তখন হঠাৎ তার ছেলে মেন্‌তুব মাঠ থেকে এসে দেখে—তার মায়ের দাঁতগুলি আধ হাত লম্বা হয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, বুকের দুধ দুটো লোটাচ্ছে মাটিতে। মেন্‌তুব বুঝতে পারল তার মা আসলে যোগিনী। তাড়াতাড়ি সে পাশের ঘরে লুকিয়ে যোগিনী মায়ের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগল। যোগিনী সেই বিরাট ইয়াক দুটোকে দুই বগলের নীচে নিয়ে ঘরের পেছনের একটা গাছে চড়ে বসল। তারপর যখনই সে গাছ নিয়ে উড়তে শুরু করবে—মেন্‌তুব চুপিচুপি নীচের দিকে উঠে বসল। যোগিনী পাহাড়-উপত্যকার উপর দিয়ে উড়তে উড়তে কার্‌গা ময়দানে এসে হাজির। সেখানে আগে থাকতেই অনেক যোগিনী এসে জমা হয়েছিল। তারা ভূতুড়ে শব্দ তুলে এই যোগিনীকে আপ্যায়ন করল। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে যোগিনীদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগল মেন্‌তুব। যোগিনীরা যেসব গরু-ভেড়া-মোষ-ইয়াক এনেছিল সবগুলিকে কেটে কুটে আগুনে ঝলসে বিরাট ভোজ। সঙ্গে সঙ্গে সব যোগিনীর নাচ গান। জিস্‌পা নামক জায়গায় এক যোগিনীকে একটা বুনোমোষ আনতে বলা হয়েছিল। সে কিছুতে তা যোগাড় করতে না-পেরে এক পাহাড়ী ভূতের পোষা শুয়োর চুরি ক'রে নিয়ে এসেছে। সে জানাল—ভূত যদি তার শুয়োর খুঁজে না-পায় তো খুব বিপদের কথা। অন্য যোগিনীরা তাকে আশ্বাস দিল—ভয়ের কোনো কারণ নেই। শুয়োরটা কেটে-কুটে খাবার পরে তার হাড়গুলো একত্র করে আবার একটা শুয়োর বানিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু শুয়োরটা খেয়ে ফেলবার পরে যখন তার হাড়গুলো একত্র করা হলো—দেখা গেল বুকের একটা হাড় নেই। তখন আর-একটা যোগিনী সেই হাড়ের জায়গায় একটা

কাঠি এনে লাগিয়ে দিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শুয়োরটা আবার আগের মতো আকার নিয়ে জীবন ফিরে পেল। তারপর চারপাশে যোগিনীদের দেখে ভয় পেয়ে লাগাল চো-চো দৌড়। শুয়োরটার কাণ্ড দেখে যোগিনীদের হাততালি দিয়ে সে কী খি-খি হাসি!

এই শুয়োরটার কথা পরে খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল। মুলিং নামে একটা জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে এক শিকারী পরে এই বুনো শুয়োরটাকে গুলি ক'রে মেরেছিল। তারপর সবাই যখন সেটাকে কেটে রান্না করতে গেছে তখন দেখে শুয়োরটার বুকের একটা হাড়ের জায়গায় কাঠি।

যাহোক কার্‌গা ময়দানে সেই রাতে যোগিনীদের খুব খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান হলো। তারপর ভূতিনীরা সবাই যে যার বাড়িতে ফিরে চলল। খোকসারের সেই যোগিনীও রাত শেষে ঘরে ফিরে এলো, সঙ্গে সঙ্গে তার অজান্তে মেন্‌ঢুব-ও। সকালে ঘুম থেকে উঠে মেন্‌ঢুবের বাড়ির সবাই দেখে—গোয়ালে দুটো ইয়াক মরে পড়ে আছে, কিন্তু তাদের গায়ে কাঁটার আঁচড়টি নেই। ইয়াক দুটো কেটে-কুটে রান্না ক'রে সবাই যখন খেল—মাংসের কোন স্বাদ পেল না। বরং তাদের মনে হলো যেন তারা ছাই চিবুচ্ছে। মেন্‌ঢুব কিন্তু বাড়ির লোককে তার মায়ের 'যোগিনী'রূপের কাণ্ডকারখানা কিছুই বলে নি। সে সেই ইয়াক দুটোর চামড়া দিয়ে খুব বড়ো দুটো ফসলের থলি বানাল। তারপর কয়েকদিন পরে বালিক্ষেতে গিয়ে ঝেড়েঝুড়ে সব বালি সেই বিরাট ইয়াকের থলি দুটোতে পুরো ভর্তি করে তার মা'কে বলল বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে। অবাক হয়ে মেন্‌ঢুবের মা বললে—"আমি বুড়ী মেয়েমানুষ, আমার কতো বয়স হয়ে গেছে। তুই কোন্ আক্কেলে আমাকে এই এতো বড়ো দুটো বালিভর্তি থলি বয়ে নিয়ে যেতে বলছিস?"

মেন্‌ঢুব উত্তর দিলে—"তুমি যখন জ্যান্ত রক্তমাংসের দুটো বড়ো

ইয়াক একাই দুই বগলে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারলে—তখন সেই ইয়াকের চামড়ার থলি ভর্তি এই বার্লির ফসল বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না ?"

মেন্‌ছুবের কথা শুনে সেই বুড়ী বুঝতে পারল—ছেলে তার 'যোগিনী' রূপের সব কথা জেনে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এমন ধাক্কা লাগল যে সে অজ্ঞান হয়ে মাঠের মধ্যে পড়ে গিয়ে সত্যি সত্যিই মরে গেল।



বরুণদেব আর বিজলীরাণীর কাহিনী

সে এক প্রাচীন যুগের কাহিনী। দেবতার আশীর্বাদে বিশ্বাস আর প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ড প্রভাব তখন সেই কালের মানুষদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক সবে শিখেছে ক্ষেতে চাষ করতে। পাথরে ঘষে ঘষে পাথরেরই বানানো নানা' আকারের কোদাল-কাস্তে-কুড়োল তাদের সহায়।

সেই পুরানো কালে একজন গরীব লোক তার স্ত্রী ও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে থাকত। সে এতো গরীব ছিল যে পরিবারের লোকেদের দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতেও পারত না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারা জঙ্গলে সে খাবারের—বুনো ফলমূল, জীবজন্তু সংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়াত।

সেই গরীব লোকটির বড় মেয়েটির কিন্তু এত অভাব সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ছিল খুব ভালো। দেখতেও সুন্দর, আর বুদ্ধিও খুব। ছোট ভাইবোনদের সে-ই দেখাশুনা করত। সংসারে অভাবের জন্যে তার খুব দুঃখ হ'তো। সারাদিন বনের ফলমূল কুড়িয়ে সে-ও অভাব দূর

করতে চেষ্টা করত। তার সবচেয়ে দুঃখ হতো—যখন দেখত সারাদিন পরিশ্রম করে তার বাবা ক্লান্ত হ'য়ে ঘরে ফিরেছে, কিন্তু খাবার-দাবার তেমন কিছুই যোগাড় করতে পারেনি। গরীব বাবার শীর্ণ ও দুর্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তার মন দুঃখে ভরে উঠত। সে চেষ্টা করত যাতে সংসারের কিছু সাহায্য করতে পারে।

সেদিন সকালে তীর-ধনুক নিয়ে সেই লোকটি অন্যদিনের মতো জঙ্গলে জীবজন্তু শিকারের জন্যে রওনা হলো। বাবাকে না-জানিয়ে সেদিন মেয়েটিও পেছনে পেছনে চলল। খানিকটা যাবার পরে একটা বড় গাছের আড়ালে ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে আর তার বাবাকে দেখতে পেল না। জঙ্গলের মধ্যে বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে মেয়েটি হাঁফিয়ে গেল এবং তারপর একটা মহুয়া গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ পুব দিকে তার চোখের সামনে একটি অপূর্ব দৃশ্য ফুটে উঠল—শস্যে ভরা প্রাণবন্ত এক ভূমি, ফসলের গাছের উপর শস্যদানাগুলি সূর্য-কিরণে মুক্তোদানার মতো হাওয়ায় দুলছে। পরিপূর্ণ প্রাণের এক জীবন্ত ছবি!

শস্যে-ভরা এই জায়গাটি দেখে তার মন আনন্দে ভরে গেল। সে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়ে সেই ফসলের ক্ষেতে হাজির হলো। সেখানে দু'জন লোক ক্ষেতে কাজ করছিল। মেয়েটি বলে উঠল—"কী সুন্দর ফসলের ক্ষেত! কি ক'রে তোমরা এমন ফসল ফলালে?"

লোক দুটি উত্তর দিলে—"সব চেয়ে আগে জমির আগাছা বেছে তুলে ফেল, তারপর ক্ষেত চাষ করো কোদাল দিয়ে। মাটি যখন সরস হবে তখন বীজ ছড়িয়ে দিয়ো। ফসল পাবে মনের মতো।"

"এমন সুন্দর ফসল?" —মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করে।

"নিশ্চয়ই।" —লোকটি উত্তর দেয়, "কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার গাছ কেটে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরী করা।"

—এই কথা বলে সেই চাষী দুজন আবার পাথরের কোদাল-কাস্তে দিয়ে নিজেদের কাজ করতে শুরু করল।

চাষী দু'জনার কথা শুনে মেয়েটির খুব আনন্দ হলো। সে ঠিক করল বাড়ি ফিরে সে কাছাকাছি এক টুকরো জমি চাষীদের কথা-মতো পরিষ্কার ক'রে বীজ বুনে ফসল ফলাবে। তার ক্ষেত সোনালী ফসলে ভরে উঠবে। তার বাবাকে আর সকাল-সন্ধ্যে এতো কষ্ট ক'রে খাবার খুঁজতে হবে না।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে চাষী দুজনের কথা তার মাকে জানাল। তারপর তাদের কুড়েঘরের কাছে এক টুকরো জমি পরিষ্কার করে সেখানে ফসল ফলাবার মনস্থ করল।

পরের দিন তার বাবা জঙ্গলের মধ্যে চলে যাবার পরে সে একটি পাথরের কুড়োল হাতে নিয়ে পাশের জমিতে গিয়ে সেখানকার ছোট-খাট গাছ কেটে আগাছা পরিষ্কার করতে লেগে গেল। কয়েকদিন পরে জমি পরিষ্কার হলে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে চাষের উপযোগী করে তুলল। এবার জলের দরকার। আকাশের দিকে তাকাল। সেখানে মেঘের চিহ্ন নেই। কয়েকদিন কেটে গেল, কিন্তু বৃষ্টির জল পড়ল না। মেয়েটির মন ভরে গেল হতাশা আর দুঃখে। তার এতদিনের পরিশ্রম কি শুকনো মাটিতে মিলিয়ে যাবে?

সেদিন সে আবার তার জমিতে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—সেখানে ভেসে আছে জল-ভরা কালো মেঘের টুকরো। আশা-ভরা মন দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু হায়, সেই কালো মেঘের দল বৃষ্টির জলের আশীর্বাদ নিয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল না।

সেই শুকনো ক্ষেতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল—এক শ্যাম শোভন তরুণ যুবক বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। এমন সুন্দর যুবাপুরুষ আগে সে কখনও দেখেনি। নিজের অজান্তেই এই নবাগতকে দেখে তার মনে খুশীর হাওয়া বয়ে গেল।

তরুণ পুরুষটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—"তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলে?"

"দেখছিলাম বৃষ্টি হবে কিনা," মেয়েটি উত্তর দিলে, "আমার এই

ক্ষেতের জন্যে বৃষ্টির জলের দরকার। বৃষ্টির পরে আমি বীজ বুনতে পারব।"

"যদি বৃষ্টি হয়—তুমি আমাকে কি দেবে?"

—মেয়েটি একথার কোনো উত্তর দিতে পারল না। তখন সেই সুদর্শন পুরুষটি বললে—"যদি আমি বৃষ্টি এনে দিই তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

মেয়েটির মুখে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল এই প্রস্তাবে। সেই তরুণ যুবক তাকে উদ্দেশ্য করে আবার বললে—"তুমি খুব সুন্দর আর তোমার মনও ভালো। তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। তোমার পরিশ্রমের ফল মিলবে। অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার ক্ষেতে নেমে আসবে জলের ধারা"

—মেয়েটি নত মস্তকে সেই অচেনা যুবককে শ্রদ্ধা জানাল। যুবকটি জিজ্ঞেস করলে—"কিন্তু তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো?"

"সে তো আমার ভাগ্য" মেয়েটি উত্তর দিলে, "কিন্তু তুমি কতো সুন্দর! আমি তো তোমার মতো সুন্দর নই।"

"আমি সব সময় অবশ্য এমন সুন্দর থাকব না। শুধু বর্ষা ঋতুতেই আমি সৌন্দর্যে ভরপুর। বৃষ্টি চলে গেলে আমার চেহারাও বদলে যাবে। তখন আমি হয়ে যাব কুৎসিত জীর্ণ ভয়ানক, তুমি তখন আমাকে দেখে ভয় পাবে না তো?"

"একদম না।"

"বেশ। কিন্তু বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে একটা শর্ত।"

"কি?"

"আমি যেখানেই যাব তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেলে ভয় পেয়ে পালাবে না।"

"এ শর্ত আমি মেনে চলব।"

"কিন্তু তুমি যদি এ-শর্ত পালন না-করো আমি তোমার জীবন নিয়ে নেব"—সেই তরুণ পুরুষ গম্ভীর স্বরে বলল।

"ঠিক আছে।"

মেয়েটির প্রতিশ্রুতির পরে সেই যুবকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরেই এলো আকাশ ভেঙে বৃষ্টি! মেয়েটি দেখল তার ক্ষেত হয়ে উঠেছে সরস-সতেজ! কালই এই জমিতে সে বীজ বুনতে পারবে।

পরের দিন সে যখন ক্ষেতে বীজ ছড়াচ্ছিল তখন সেই যুবক আবার অরণ্যের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। মেয়েটি তাকে নিয়ে গেল তার মায়ের কাছে। আগেই যুবকটির কথা সে মা-বাবাকে বলেছিল। তারা ওদের বিয়ে দিয়ে দিল। বিবাহের পরে মা-বাবার কাছে বিদায় নিয়ে সে যুবকের সঙ্গে চলল।

যুবকটি তাকে নিয়ে গিয়ে সংসার পাতল দূর পাহাড়ের উঁচু গুহায়। সুখে দিন কাটতে লাগল তাদের।

একদিন সকালে আচমকা ঘুম ভেঙে মেয়েটি দেখল—তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ানক চেহারার এক ব্যক্তি। তার শরীরে আবরণ নেই, সব জায়গায় কাদা-মাটির দাগ, কতকগুলি সাপ কিলবিল করছে তার গলায় মাথায়। চুলগুলি এলোমেলো রুক্ষ। চোখ আগুনের মতো লাল।

মেয়েটি ভয়ে বাক্‌হারা নিস্পন্দ। সে উর্ধ্বশ্বাসে সেখানে পালাতে গেল। পুরুষটি দেখল মেয়েটি বিয়ের-আগে দেওয়া শর্ত পালন করছে না। সে রেগে গিয়ে একখণ্ড পাথর দিয়ে মেয়েটিকে মারতে গেল।

মেয়েটি চকিতে আগুনের শিখার মতো উড়ে গেল আকাশে, পুরুষটি ভয়ানক গর্জন করতে করতে ধেয়ে চলল তার পেছনে।

এইভাবে সে মেয়েটি হয়ে গেল মেঘ-ভরা আকাশের বিজলিশিখা আর পুরুষটি ব বৃষ্টির অধিপতি বরুণদেব।



রোতাং-এর কিম্বদন্তী

হিমাচল প্রদেশের মধ্য-উত্তর ভাগে কুলু জেলা। কুলুর দশেরা উৎসব বিশ্ববিখ্যাত।

কুলু শহর থেকে আরও উপরের দিকে মানালী। মানালী থেকে এগিয়ে কোঠি-রাহালা ছাড়ালে বরফে-ঢাকা রোতাং পাশ।

রোতাং পাশ দিয়েই ঢুকতে হয় বিচিত্র রীতি-নীতি সামাজিক প্রথার দুর্গম পাহাড়ী জনপদ লাহুলে। তাই রোতাংকে বলা হয় 'গেট ওয়ে টু লাহুল।'

রোতাং গিরিবর্ত্মের উচ্চতা ১৩,০৫০ ফুট। শুধু কলু জেলার সঙ্গেই নয়, বহির্জগতের সঙ্গেও লাহুলের এটিই হলো প্রধান যোগসূত্র।

'রোথাং একটি তিব্বতী শব্দ। অর্থ হলো—'মৃতদেহের স্তূপ' (রো=মৃতদেহ, থাং=স্তূপ)। রোথাং-ই লোকের মুখে মুখে রোতাং। রোতাং সার্থকনামা। অতীতে এই গিরিপথে অসংখ্য মানুষ-জীবজন্তু প্রাণ হারিয়েছে আকস্মিক তুষার-ঝড়ে।

শোনা যায়—প্রাচীনকালে রোতাং পাশের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এখানে মাথা উঁচু ক'রে ছিল দুর্ভেদ্য পাহাড়-প্রাচীর। সেই পর্বত-প্রাচীর বাধা কি ভাবে দূর হলো?

সেই ঘটনাটি নিয়েই এই কাহিনী। কুলুর অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত এক কাহিনী অনুসারে দেবাদিদেব শিবের বহু আরাধনা করার পরে, অবশেষে একটি শিশু এবং এক কুমারী কন্যাকে উৎসর্গ করলে, কুলু আর লাহুলের অধিবাসীদের কাতর প্রার্থনায় মহাদেব তাঁর কশাঘাতের প্রবল আঘাতে প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে রোতাং পাশের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় কাহিনীটি চমকপ্রদ। এ-কাহিনীটি লাহুলীদের মধ্যে প্রচলিত।

অনেকদিন আগের কথা। পশ্চিম তিব্বতে গিয়াপো গিয়াসের নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিব্বতের আশে-পাশের বহু রাজ্য তিনি জয় ক'রে নিয়েছিলেন।

রাজার ছিল এক পক্ষীরাজ ঘোড়া। নাম—থুরু কিয়াংবোং। তিব্বতী ভাষায় 'থুরু' মানে ঘোড়া। থুরু কিয়াংবোং'র পিঠে চড়ে রাজা রাজ্যজয় করতে যেতেন। লাহুলের মধ্য দিয়ে রাজ্য জয় করতে করতে গিয়াপো গিয়াসের খোকসার-নামে জায়গায় এসে বাধা পান। বলা বাহুল্য—তখন রোতাং পাশ ছিল না। রাজার খুব জানতে ইচ্ছে হলো—পাহাড়-প্রাচীরের ওধারে কি আছে? থুরুর পক্ষে তাই সম্ভব ছিল না অতো উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া। তাই তিনি তাঁর হাতের জাদু রশ্মি 'তালচা' (তালচা=ঘোড়ার চাবুক) দিয়ে দু'বার প্রচণ্ড আঘাত হানলেন—তাতে খোকসারের উপর দিয়ে এক পাহাড়ী পথ হয়ে গেল। রাজা যখন আবার আঘাত করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গিনী পরামর্শদাত্রী দেবী গিয়াপো'কে বললেন —"তুমি এইভাবে পাহাড় আরো নীচু ক'রে পথ বানিয়ো না। তা হ'লে লাহুলের বৌদ্ধরা অনায়াসে ওপারে গিয়ে কুলু এবং সমতলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যাবে। এই উঁচু পার্বত্য প্রদেশের মানুষের পক্ষে সেটা ভালো হবে না।"

দেবীর কথামতো রাজা পাহাড়ের উপর আর আঘাত করলেন না বটে, তবে তিনি নিজে রাহালায় এসে হাজির হলেন। সেখানে তাঁর

সঙ্গে দেখা হলো এক সুন্দরী মোহময়ী ছদ্মবেশিনী রাক্ষসীর সঙ্গে। রাজা সেই সুন্দরী রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে নিজের রাজ্যপাট-রাণী—সব কিছুর কথা ভুলে গিয়ে সেখানে তার সঙ্গেই বাস করতে লাগলেন।

ওদিকে তিব্বতে গিয়াপো'র নিজের রাজ্য আক্রান্ত হলো, প্রতিবেশী শত্রুরাজা তাঁর সৈন্যদের হারিয়ে দিল, রাজধানী হলো বিধ্বস্ত, আর রাণীদের নিয়ে গেল বিজয়ী রাজা। প্রজারা বিদেশী রাজার অত্যাচারের মধ্যে দিনাতিপাত করতে করতে অবিরাম প্রার্থনা করতে লাগল রাজার ফিরে আসার। রাজ্যের এক জ্ঞানী বৃদ্ধ গিয়াপো'র কাছে সংবাদ পাঠাবার সিদ্ধান্ত করলেন। একখানি চিঠিতে রাজ্যের অবস্থা বিস্তারিত জানিয়ে সেই চিঠি পায়রার পায়ে বেঁধে দিয়ে তাকে উড়িয়ে দেওয়া হলো গিয়াপো'র উদ্দেশে।

পায়রা আকাশে উড়ে উড়ে খুঁজতে লাগল—কোথায় রাজা গিয়াপো। অবশেষে রাহালা'র আকাশে এসে দেখল—গিয়াপো নীচে এক সুন্দরী নারীর সঙ্গে দাবা খেলছেন। রাজাও এই সময় উপরের দিকে তাকিয়ে তাঁর সংবাদবাহী পায়রাকে চিনতে পারলেন। ভাবলেন—পায়রাটা যদি নেমে এসে তাঁর ডান দিকে বসে তবে সে বহন ক'রে এনেছে শুভ সংবাদ, আর বাঁ দিকে বসলে সংবাদ হবে অশুভ। পায়রা আকাশ থেকে নেমে এসে রাজার বাঁ দিকেই বসল। আশঙ্কায় কেঁপে উঠল রাজার মন। তাড়াতাড়ি পাখীর পায়ে-বাঁধা চিঠি খুলে নিয়ে পড়লেন। জানতে পারলেন নিজ রাজ্যের দুরবস্থার কথা, রাণীদের হারানোর কথা। স্থির করলেন—এখনই তিনি আপন রাজ্যে ফিরে যাবেন।

মায়াময়ী রাক্ষসীর কাছে যখন তিনি ফিরে যাবার কথা বললেন—সে কাঁদতে শুরু করল। আবদার ধরল—সে-ও সঙ্গে যাবে। রাজা কি করবেন বুঝতে না-পেরে তাঁর আরাধ্যা দেবীর পরামর্শ চাইলেন। দেবী বললেন—রাক্ষসীকে তাঁর দেশে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তা

হলে রাজ্যের দেব-দেবীরা অসন্তুষ্ট হবেন। দেবী পরামর্শ দিলেন—সবচেয়ে ভালো হয় গিয়াপো যদি ফন্দী ক'রে রাক্ষসীকে মেরে ফেলতে পারেন। ফিরবার সময় রাজা বলবেন যে থুরুর পিঠে চেপে মাত্র একজন লোকই যেতে পারে। তাই রাজা থুরুর পিঠে উঠে উড়বার আগে রাক্ষসী যদি তার লেজ ধ'রে ঝুলে থাকে তাহ'লেই সবচেয়ে ভালো হয়।

দেবীর পরামর্শমতো এই কথা রাজা রাক্ষসীকে বললেন।—রাক্ষসী তাতেই রাজী হলো। রাজা পক্ষীরাজের পিঠে চ'ড়ে বসলেন। কিন্তু রাক্ষসী যখনই তার লেজ ধরতে গেছে—থুরু কিয়াংবোং তাকে পেছনের পা দিয়ে মেরেছে জোর এক লাথি। পেছনে ছিল পাথর। লাথি খেয়ে ভীষণ জোরে পাথরে আছড়ে প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে রাক্ষসী। থুরু এমনই জোরে রাক্ষসীকে আঘাত ক'রেছিল যে—যে-পাথরের উপর সে আছড়ে পড়েছিল সে-পাথরে রমণী দেহের অবয়বের ছাপ পর্যন্ত পড়ে গেছে। রোতাং-এর পথে এক পাথরে লোকেরা সেই ছাপ আজও দেখায়।

রাজা পক্ষীরাজ থুরু'র পিঠে চেপে তিব্বতে ফিরে গেছেন। রাহালায় আসবার আগে তাঁর জাদু-রশ্মি তাল্‌চার আঘাতে পর্বতের উপর যে-পথ তিনি সৃষ্টি ক'রেছিলেন—তারই নাম রোতাং গিরিবর্ত্ম, লাহুল ও কুলুর মধ্যে যোগসূত্র।



বর্মা পাহাড়ের খুন সান আর নান য়ু পীন

বর্মার পার্বত্য অঞ্চলে সুন্দর সুন্দর লোককথা প্রচলিত। এমনই একটি লোককথা হলো খুন সান আর নান য়ু পীনের। বর্মার কারেন আর কায়াহ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গল্পটি শোনা যায়।

সে অনেক কাল আগের কথা। এক বৃদ্ধ দম্পতির ছিল একটি খুব সুন্দরী মেয়ে। গাঁয়ের সব ছেলে তাকে বিয়ে করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু বিয়েতে মেয়েটির মন নেই। একদিন তার মা বলল—"বাছা, তুমি এখন বড় হয়েছ। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে কাউকে পছন্দ ক'রে বিয়ে করো।" কিন্তু সুন্দরী মেয়েটি শুধু একটু মিষ্টি হেসে চুপ ক'রে থাকে।

কিছুদিন পরে তার বাবা মারা গেল। তার মা তখন আবার বলল—"তোমার বাবা মারা গিয়েছে। ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই। তুমি বিয়ে করলে ঘরে জামাই আসবে। একটা পুরুষ মানুষ কাছে থাকলে অনেক ভরসা। গাঁয়ের কাউকে কি তোমার পছন্দ হয় না?"

তখন মেয়েটি উত্তর দিলে—"মা, গাঁয়ের ছেলেদের কাউকে আমি বিয়ে করতে ভরসা পাই না। স্বামী হয়ে তখন যদি আমার উপর

অত্যাচার করে? তখন আমাদের চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। সত্যিই যদি তুমি ঘরে কোনো পুরুষ মানুষের দরকার মনে করো, আমি চেরি গাছের দেবতার কাছ থেকে একটি পুত্র-সন্তান প্রার্থনা করব! দেবতা নিশ্চয়ই আমাকে নিরাশ করবেন না।"

মা মেয়ের কথা হেসে উড়িয়ে দিল। মেয়েটি কিন্তু সত্যিই কয়েক-দিন পরে চেরিগাছের দেবতার কাছ থেকে একটি ছেলে নিয়ে এলো। সেই সুন্দর শিশুর নাম রাখা হলো খুন সান।

খুন সানের যখন ছ'বছর বয়স তখন তার মা এবং দিদিমা দুজনেই মারা গেল। তখন গাঁয়ের এক নিঃসন্তান ধনী বিধবা তাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে লাগল। তরুণ বয়সে খুন সানের চেহারা হলো খুব সুন্দর। গাঁয়ের সব মেয়ে তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল। খুন সানের কিন্তু তাদের কাউকে পছন্দ নয়।

গাঁয়ে ছিল একজন কুটিল স্বভাবের কুশ্রী মেয়ে। সে মনের মধ্যে মতলব এঁটে খুন সানের পালিকা মাকে গিয়ে বলল—"আমি তোমাকে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসি। এসো, তোমার পা টিপে দিই।" —এইভাবে নানারকমে সে তার মন জয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। রোজ এসে নানাভাবে তার সেবা-শুশ্রূষা করে। মেয়েটির তোষামোদ ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন খুন সানের সেই পালিকা মা বলল—"তোমার ব্যবহারে আমি খুব খুশী। তোমার সঙ্গে আমি বিয়ে দেব আমার খুন সানের।" তারপর সে খুন সানকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—"বাছা, তুমি কি কোন মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে পছন্দ করেছ?" খুন সান উত্তর দিল—"না, মা।"

"তা হলে আমি তোমার জন্যে একটি মেয়ে পছন্দ করেছি। এই মেয়েটি খুব গুণের। একে আমি পুত্রবধূ করব।"

খুন সান সেই কুটিলা কুশ্রী মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। তার একদম ভালো লাগল না তাকে। পালিকা মাকে সে বলল যে তার

বয়স এখনও কম। বিয়ের সময় এখনও হয়নি। তারপর সেই মতলবী মেয়েটির খপ্পর থেকে পালাবার জন্যে তার মাকে বলল যে—গাঁয়ে একজন ব্যবসায়ী এসেছে। সে তাদের সঙ্গে দূরদেশে যাবে যদি কিছু টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারে।

তার মা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলের আগ্রহে তাকে বিদেশে বাণিজ্য-যাত্রায় সম্মতি দিল।

বিদেশের এক শহরে গিয়ে খুন সান একদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়ির সামনের ফুল বাগানের দিকে তার চোখ গেল। সেখানে ঝাঁঝরি দিয়ে ফুল গাছে জল দিচ্ছিল খুব সুন্দরী একটি মেয়ে। খুন সানের খুব ভালো লেগে গেল অচেনা সেই মেয়েটিকে। মেয়েটিও তার দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসল। খুন সান কাছে এসে তার নাম জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি বললে—"আমার নাম নান য়ু পীন। তুমি কোত্থেকে এসেছো?" খুন সান নিজের পরিচ দিয়ে বললে যে সে নান পীনকে দেখে ভালোবেসে ফেলেছে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। নান পীন বললে—"তোমাকে আমারও ভালো লেগেছে। কিন্তু তুমি তো অচেনা দেশের অজানা মানুষ। যদি আমাকে বিয়ে করতে চাও তো আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলো।"

অপরিচিত জায়গা হলেও খুন সান নান পীনের মা-বাবার কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল। খুন সানকে দেখে ও তার কথাবার্তা শুনে তাদেরও ভালো লাগল। পরের দিন মহাসমারোহে খুন সানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল নান পীনের।

বিয়ের পরে কিছুদিন খুব আনন্দে কাটল খুন সানের। তারপর তার মনে হলো যে এখন তার পালিকা মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তার বিয়ের কথা জানানো উচিত। নান পীনকে কয়েকদিন পরে ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা হলো। বাড়ি ফিরে মাকে সে তার বিয়ের কথা জানাল। যদিও তার বিধবা পালিকা

মা বিয়ের কথা শুনে খুব রেগে গেল, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না-ক'রে বরং বললে—"খুব ভালো কাজ করেছ, বাছা। কিন্তু তোমার বউয়ের কাছে আবার ফিরে যাবার আগে উত্তর অঞ্চলে আমার রাবার বাগানে গিয়ে মজুরদের কাজকর্মের দেখা শুনা ক'রে একটু সুব্যবস্থা ক'রে এসো।"

খুন সান উত্তর অঞ্চলে পৌঁছবাঁর আগে সেখানকার মজুর-সর্দারকে ডেকে তার পালিকা মা তাকে নির্দেশ দিল যে—রাবার বাগানের মজুররা যেন খুন সানের সামনে নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার ভান করে। ফলে মজুরদের মধ্যে এই ঝগড়াঝাঁটি না-মেটা পর্যন্ত খুন সান আর ফিরে আসতে পারবে না।

খুন সানের পালিকা মা ভেবেছিল যে এইভাবে স্ত্রীর কাছে খুন সানের যেতে দেরি হলে তার স্ত্রী তাকে ভুলে যাবে। কিন্তু নান পীন স্বামীর ফিরে আসার জন্যে পথ চেয়ে বসেছিল। খুন সান আর ফিরে আসছে না দেখে সে অধীর হয়ে উঠল, তারপর একদিন তার কয়েক-জন প্রিয় সখী ও আপনজনকে নিয়ে খুন সানের গ্রামের দিকে রওনা হলো। সেখানে এসে পৌঁছলে খুন সানের পালিকা মা মুখে তাদের সাদর অভ্যর্থনা করল বটে, কিন্তু মনে মনে মতলব আঁটতে লাগল—কি করে নান পীনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। নান পীনকে সে ঘরের সব রকম কাজ করার ভার দিল। বেচারা নান পীন সকাল-সন্ধ্যে ঘরের সব রকম কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠলেও মুখ বুজে সকল কষ্ট সহ্য করতে লাগল। তবু তার শাশুড়ীর মন ওঠে না। উঠতে বসতে সে কটু কথা বলে গালি দিতে লাগল নান পীনকে। বাপের বাড়ির লোকেদের সামনে শাশুড়ীর এই অত্যাচার ও অপমান অসহ্য হয়ে উঠলে নান পীন একদিন তার আপনজনদের নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে চলল। নান পীন তখন গর্ভবতী ছিল। রাস্তায় তার একটি বাচ্চা হলো, কিন্তু বাঁচল না। মরা ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে নান পীন বলতে লাগল—"আমি তোমাকে নদীর জলে ফেলব না,

তাহলে তুমি মাছ হয়ে যেতে পার ; আমি তোমাকে মাঠের মধ্যেও ফেলে যাব না, তাহলে হয়ত তুমি ব্যাঙ হয়ে যাবে। বরং আমি তোমাকে চেরি গাছের শাখায় রেখে যাব। তাহলে তোমার বাবা যখন আমার কথা শুনে এই পথ দিয়ে আমার খোঁজে আসবে— তোমাকে দেখতে পাবে।"

—এই কথা বলে চেরি গাছের ডালে মৃত সন্তানটিকে ভালো ভাবে রেখে সঙ্গীদের নিয়ে সে আবার বাপের বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল।

চেরি গাছের শাখায় মৃত শিশুটি কিন্তু পাখী হয়ে "বাবা-বাবা" ডাকতে লাগল, তারপর তার পিতা খুন সানের উদ্দেশে উড়ে চলল সে।

ওদিকে নান পীন তার বাপের বাড়িতে ফিরে এলো বটে কিন্তু তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখে-কষ্টে সে মৃত্যু পথে এগিয়ে যেতে লাগল। তার বাঁচার আশা ছিল না।

খুন সান রাবার বাগান থেকে এক সময় তার গ্রামে ফিরে এলো। ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত গ্রামবাসী তার স্ত্রীর প্রতি তার পালিকা মায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা সব জানিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটি ঘোড়ার পিঠে চেপে স্ত্রীর সন্ধানে ছুটে চলল। যখন সে নান পীনের কাছে পৌঁছল তখন সে মারা গিয়েছে। স্ত্রীর মৃতদেহের কাছে গিয়ে খুন সান কেঁদে কেঁদে বলল—"আমিও তোমার কাছে শীগগীরই আসছি। তারপর আমরা দুজনে আকাশের বুকে পাশাপাশি দুটি তারা হয়ে থাকব। তিনলোক ধ্বংস হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।"—এই অন্তিম কামনা জানাবার পরে খুন সান-ও মারা গেল।

নান পীনের বাবা-মা তাদের মৃতদেহ দুটি পাশাপাশি শুইয়ে রেখে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করতে লাগল এবং খুন সানের পালিকা মাকে খবর দিল শেষ কাজে যোগ দেবার জন্যে। বৃদ্ধা

পালিকা মা এসে যখন তাদের স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ দুটি পাশাপাশি শোয়ানো দেখল তখনও তার মনে দুঃখ-কষ্টের বদলে জ্বলে উঠল ঈর্ষা আর ক্রোধের আগুন। মেঝেতে পড়ে থাকা তিনটি গাঁটঅলা একটি বাঁশের টুকরো সে মৃতদেহ দুটির মাঝখানে তাড়াতাড়ি রেখে দিল। নান পীনের শোকাকুল পরিবার তার এই কাজ কেউ লক্ষ্য করল না।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়ে যাবার পরে সেদিন রাতেই খুন সান আর নান পীন আকাশের বুকে দেখা দিল দুটি তারা রূপে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—তাদের মাঝখানে বিচ্ছেদ রচনা করে জ্বলছিল আরও তিনটি তারা—খুন সানের পালিকা মায়ের রাখা সেই বাঁশের টুকরোটির তিনটি গাঁট।

তারা-জ্বলা সেই আকাশের নীচে মাটির পৃথিবীতে গাছের ডালে উড়ে উড়ে "বাবা—বাবা" বলে ডেকে যাচ্ছিল খুন সান আর নান পীনের পাখী-হয়ে যাওয়া মৃত ছেলে।



মিণ্ডলের দেবী চামুণ্ডা ও এক বুড়ী

হিমাচলের চম্বা জেলায় মিণ্ডল নামে একটি জায়গা। ছোট্ট একটি পাহাড়ী গ্রাম। সেখানে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। মন্দিরের সামনে একখণ্ড পাথর—এক বুড়ির প্রতীক। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মিণ্ডলে একদিনের জন্যে মেলা বসে। মেলায় এসে লোকেরা মন্দিরের সামনে রাখা বুড়ির প্রতীক সেই পাথরকে আগে পুজো দেয়, তারপর মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবী ভগবতী চামুণ্ডার।

কেন ?

সেই কাহিনীই বলছি।

ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম মিণ্ডলে আজ যেখানে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির আগে সেখানে এক বিধবা বুড়ির বাড়ি ছিল। সে বুড়ির ছিল সাত ছেলে। সাত ছেলের সাত বউ। তারা সবাই মাঠে কাজ করতে যেত, আর মাকে ঘরে রেখে যেত সংসারের কাজকর্ম করার জন্যে। কিন্তু রান্না করতে গিয়ে বুড়ির রোজ অসুবিধে হতো। কারণ যে-উনুনে সে রান্না করত তার মধ্য থেকে রোজ একটা কালো পাথরের টুকরো মাথা বার করে থাকত। বুড়ি যতবারই পাথরের টুকরোটাকে

ভিতরের দিকে ঠেলে দিত আবার সে ঠিক মাথা তুলে বার হয়ে আসত রান্না করার সময়ে। ছেলেদের একথা বলায় তারা এটাকে তুচ্ছ ব্যাপার বলে অবহেলা করত। প্রতিবেশীদের বললে তারাও এটাকে বুড়ির বেশী বয়সের ভীমরতি মনে করে তার কথায় কান দিত না।

সেদিন বউদের নিয়ে ছেলেরা মাঠে চলে গেলে বুড়ি রান্না করতে গিয়ে দেখে—সেই কালো পাথরের যন্ত্রণাটা ঠিক মাথা তুলে আছে। আজ মরিয়া হয়ে বুড়ি যখন প্রাণপণে পাথরের টুকরোটাকে নীচের দিকে ঠেলে দিতে গেল—অবাক কাণ্ড! সেই পাথরের টুকরোটা একেবারে উঠে এসে কথা বলতে লাগল—

"আমি ভগবতী চামুণ্ডা। কালো পাথরের রূপে তোমার উনুনের মধ্যে পড়ে আছি। সবাইকে ডেকে এনে মিশুলে আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা কর।"

দেবীর কথা শুনে বুড়ির তো ভিরমি খাবার অবস্থা! দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে মাঠে গেল বুড়ি। সেখানে তার ছেলেরা একটা মোষ দিয়ে হালচাষ করছিল। কারণ অন্য মোষটা মরে গিয়েছিল। এজন্যে তাদের জমি চাষ করতে খুব কষ্ট হতো।

যা হোক, বুড়ি গিয়ে তার ছেলেদের উনুনে দেবী চামুণ্ডার আবির্ভাবের কথা বলল। ছেলেরা সে-কথা বিশ্বাস তো করলই না, বরং বুড়ো বয়সে মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে ঠাট্টা করে মাকে বাড়ি গিয়ে রান্নাবান্না করে ঘরের কাজ করতে বলল। ছেলেদের বউরা আবার টিপ্পনী কেটে বলল—"বুড়ির শুধু কাজকর্ম না-ক'রে ফাঁকি দেবার মতলব!" ছেলেদের একজন ঠাট্টা করল—"তোমার দেবী কি আমাদের একটা মাত্র মোষ দিয়ে চাষ করবার কষ্ট দূর করবে?"

বিফল হয়ে বিষণ্ণ বুড়ি ঘরে ফিরে দেবী চামুণ্ডাকে সব কথা জানাল। চামুণ্ডা রেগে গিয়ে বুড়ির সব ছেলে আর তাদের বউদেরও পাথর ক'রে দিলেন।

মিগুল গ্রামের মাঠে বুড়ির সেই সাত ছেলে আর তাদের বউদের পাথর-হওয়া মূর্তি আজও দেখা যায়।

দেবী আরও শাপ দিয়েছিলেন যে এরপর মিগুলের মানুষদের একটা মোষ দিয়েই কষ্ট ক'রে হালচাষ করতে হবে। অভিশাপ দেবার পরে দেবী আদেশ দিলেন বুড়িকে মিগুলের যে-কোন লোককে ডেকে নিয়ে আসতে।

বুড়ি আবার গ্রামের মধ্যে গেল। কিন্তু যেখানেই যায়—দেখে সেখানকার লোক হয় ঘুমুচ্ছে নয় সুতো কাটছে। গ্রামের লোকেরা জানত যে সাত ছেলের মা এই বুড়ি উনুনের মধ্যে একটা কালো পাথরের কথা বলে প্রায়ই বিরক্ত করে। তাই কেউই তার কথা কান দিল না। বুড়ি গিয়ে আবার সব কথা বলতে দেবী চামুণ্ডা রেগে গিয়ে শাপ দিলেন যে এরপর থেকে এই গ্রামের কোন লোক আর চারপাইতে শুতে পারবে না, আর পারবে না সুতো কাটতে।

দেবী তো রাগের মাথায় শাপ দিয়ে দিলেন। তারপর রাগ যখন একটু কমল দেখলেন—বেচারা বুড়ি তাঁর সামনে বসে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। একটু শান্ত হয়ে দেবী বর চাইতে বললেন বুড়িকে। বুড়িই একমাত্র যথাসাধ্য দেবীর আদেশ পালন ক'রেছিল।

বুড়ি মনে সাহস এনে বর চাইলে—"আমাকেও পাথর বানিয়ে দাও।"

এই অদ্ভুত বর প্রার্থনায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দেবী চামুণ্ডা। কিন্তু বুড়ি বললে যে সে একা 'মানুষ' হয়ে থেকে কি করবে? তার সাত ছেলে, ছেলের বউরা সবাই তো পাথর হয়ে গিয়েছে দেবীর শাপে।

পুত্র, পুত্রবধূহীনা বুড়ির অসহায় শোচনীয় অবস্থা কল্পনা করে চামুণ্ডা তার প্রার্থনা পূরণ করলেন বটে, তবে বুড়ির আজ্ঞা পালনে খুশি হয়ে যোগ ক'রে দিলেন যে—এরপর থেকে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে লোকে আগে এই বুড়ির পুজো করবে, তারপরে তাঁর।

আজও এই প্রথা মিগুল গ্রামে পালন করা হয়।



চাষী বউ ও চার কাঠপুতুল

সে ছিল সাদাসিধে প্রকৃতির এক পরিশ্রমী আর সৎ কৃষাণ। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে গরু ও জোয়াল নিয়ে ক্ষেতে চাষ করতে যেত। সারাদিন ক্ষেতে কাজ ক'রে সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরে আসত।

কিন্তু চাষীর বউ ছিল খুব অলস আর আরামপ্রিয়। ঘরের কাজকর্ম কিছুই করত না। বেচারা চাষী সারাদিন পরিশ্রম করত, আর ঘরে তার বউ সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোত। স্বামীর সুখ সুবিধের দিকে তার একদম দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, সারাদিন ক্ষেতে কাজ ক'রে ঘরে ফেরার পরে চাষীকেই আবার কষ্ট ক'রে হাত পুড়িয়ে নিজের এবং স্ত্রী'র খাবার বানাতে হ'তো।

এর উপর রাতে খাবার-দাবার পরে চাষীবউ এমন ভান করত যেন তার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে। ফলে এত পরিশ্রমের পরে রাত জেগে আবার বউয়ের সেবা করতে হতো চাষীকে। তার খুব খারাপ লাগত, কিন্তু কি করবে ভেবে পেত না।

অনেকদিন ধরে এমন ভাবে চলল। সারাদিন পরিশ্রম ক'রে ঘরে ফিরে খাবার বানিয়ে বউকে খাওয়াবার পরেও চাষী বউ সেই একই রকম বিছানায় আরামে শুয়ে কাতরাতো যেন তার কতো কষ্ট

হচ্ছে। রোজ রোজ বউয়ের সেবা ক'রে সেদিন চাষীর খুব রাগ হয়ে গেল। সেদিন আর সে বউয়ের কাতরানিতে কান না-দিয়ে বোনের বাড়িতে গিয়ে তাকে সব কথা বলল। বোন তাকে পরামর্শ দিল যে একদিন ক্ষেতে না-গিয়ে ঘরের কাছে লুকিয়ে থেকে চাষী যেন দেখে তার বউ সারাদিন কি ক'রে কাটায়।

বোনের পরামর্শ মতো চাষী সেদিন আর মাঠে গেল না। ঘরের কাছে লুকিয়ে বউয়ের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হ'য়ে গেল। তার বউ খুব ভালো ভালো মুখরোচক খাবার বানাচ্ছে। দেখে চাষীর খুব খেতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু লোভ সামলিয়ে বউয়ের কাজকর্ম দেখে যেতে লাগল।

খাবার বানিয়ে খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেলে তার বউ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুম। চাষী সেদিন আর মাঠে গেল না। সারাদিন এদিক-ওদিক ঘোরাফিরা ক'রে সন্ধ্যের সময় অন্যদিনের মতো তার স্ত্রী'র সামনে হাজির হলো; আর সঙ্গে সঙ্গে চাষী বউ কাতর শব্দ করতে লাগল যেন পেটের ব্যথায় তার কতো কষ্ট হচ্ছে!

পরের দিন বোনের বাড়িতে গিয়ে চাষী সব কথা জানাল। তার বোন ছিল খুব বুদ্ধিমতী। সে কাঠপুতুলওয়ালাদের বাড়িতে গিয়ে চারটি কথা-বলা পুতুল বানিয়ে আনল। এই পুতুলগুলির বিশেষত্ব হলো যে—কেউ কোনো অন্যায় কাজ করলেই তারা কথা বলে উঠবে। পুতুলগুলি কিনে নিয়ে ভাইকে দিয়ে চাষীর বোন বললে—"তুমি এই পুতুলগুলি নিয়ে বউকে না-জানিয়ে ঘরের চার কোণে লুকিয়ে রাখ। যখনই তোমার বউ কোনো অন্যায় কাজ করবে পুতুলগুলি কথা ব'লে উঠে তাকে ভয় দেখাবে যাতে সে বিসদৃশ কোনো কাজ না-করে।"

চাষী ঘরে ফিরে বোনের কথা মতো রাতে বউ ঘুমুলে পরে পুতুল চারটিকে ঘরের চারকোণে লুকিয়ে রাখল।

পরের দিন সকালে চাষী মাঠে চলে যাবার পরে তার বউ বিছানা থেকে উঠে অন্যদিনের মতো ফুলুরি-বেগুনি—সব মুখরোচক খাবার বানাতে শুরু করল। অমনি এক কোণ থেকে প্রথম পুতুলটি বলে উঠল—"আহা, কী সুন্দর! মহারানী চমৎকার ফুলুরি-বেগুনি ভাজছেন!"

দ্বিতীয় পুতুলটি বললে—"ও, তুমি জান না, এ হচ্ছে তার রোজকার কাজ!"

অন্য কোণ থেকে তৃতীয় পুতুলটি বললে—"আরে, তোরা চুপ কর না। চাষী বউ যদি আমাদের কথা শোনে তবে ভয় পাবে যে!"

চতুর্থ পুতুলটি মন্তব্য করল—"যদি ভয়ই পাবে—তবে স্বামীকে লুকিয়ে এমন অন্যায় কাজই বা কেন করছে?"

চাষী বউ সত্যিই কাঠপুতুলদের কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে ঘরের মধ্যে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। কি করবে ভেবে পেল না। ঘরের মধ্যে কারা এমন ভাবে কথা বলছে? কোথাও তো কেউ নেই।

চুপচাপ সে বসে রইল খানিকক্ষণ। একটু সাহস ফিরে পেলে আবার সে ফুলুরি-বেগুনি বানাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে আগের মতোই চার পুতুলের মন্তব্য শুনতে পেল।

চাষী বউয়ের হাতের কাজ থেমে গেল। সে বুঝতে পারল ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ভূত এসে আস্তানা গেড়েছে। খাবারের সাজ-সরঞ্জাম যেখানে যেমন ছিল ফেলে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সে চাষীর কাছে গিয়ে হাজির। হাঁফাতে হাঁফাতে সে মাঠের মধ্যে বসে পড়ল।

বউকে এইভাবে আসতে দেখে চাষীর খুব হাসি পেল। কিন্তু কোনো কথা না-বলে সে আগের মতোই জমি চাষ করতে লাগল। তখন তার বউ কোনোক্রমে উঠে শরীরটা টেনে নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে বলল যে ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ভূত এসে বাসা বেঁধেছে, তারা আবার নানা কথাও বলছে।

চাষী জিজ্ঞেস করল—"ভূতগুলি কি কথা বলছে ?"

বাধ্য হয়ে চাষী বউকে তার সকালের খাবার বানানো নিয়ে চারটি পুতুল যে চারটি মন্তব্য করেছে, সেগুলি বলতে হলো।

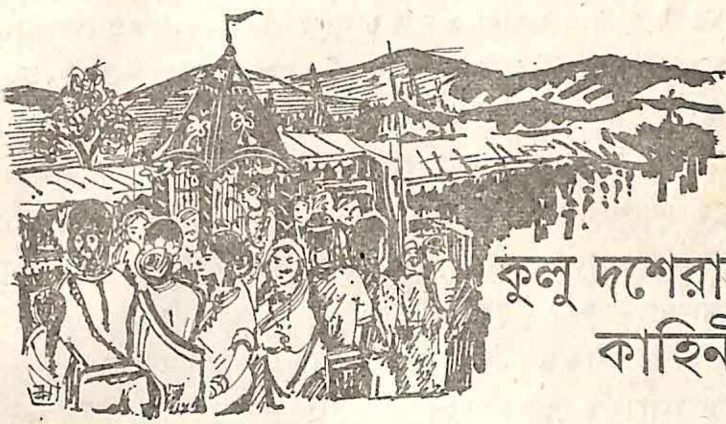
চাষী আবার জিজ্ঞেস করল—"এসব কি সত্যি যে তুমি ঐসব মুখরোচক ফুলুরি-বেগুনি বানাচ্ছিলে ?"

চাষী বউকে তার অপকর্মের কথা স্বীকার করতেই হলো। চাষী বললে—"কী আশ্চর্য ! তুমি বলতে যে পেটের ব্যথায় বিছানা থেকে উঠতে পার না. আর আমাকে লুকিয়ে ঐসব ভালো ভালো খাবার বানিয়ে একা-একা খাও ? ঠিক আছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো যে ভবিষ্যতে আর কখনও এমন কাজ করবে না, আর মিথ্যে অসুখের ভান-ও দেখাবে না।"

চাষী বউ বললে—"এই কান ধরছি, নাক মলছি, আর কখনও এমন করব না। তুমি আমাকে ভূতের হাত থেকে বাঁচাও !"

চাষী হেসে বউকে ভরসা দিল যে-ভূতেরা আর তাকে ভয় দেখাবে না। সে বোনের বাড়ি থেকে ভূত তাড়াবার মন্ত্র শিখে এসেছে। "চলো, বাড়ি গিয়ে ভূতদের তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

চাষী বউয়ের স্বভাব এরপর থেকে সত্যিই ভালো হয়ে গেল। সে আর অসুখের ভান করে বিছানায় শুয়ে কাতরাতো না, ঘরের কাজকর্ম সব করত; এমন কি, চাষের কাজেও স্বামীকে সাহায্য করত। তাকে দেখে এখন কে বলবে যে আগে সে এমন অলস ছিল ?



কুলু দশেরার কাহিনী

হিমাচলপ্রদেশের কুলু শহরের দশেরা উৎসব বিশ্ববিখ্যাত। দশেরা উৎসবের সময় দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক এসে কুলু শহরে ভিড় করে। দশেরা উৎসব কুলুর প্রধান দেবতা রঘুনাথজীকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত। এই পাহাড়ী জনপদে রঘুনাথজী'র প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত।

কুলু শতেক দেবালয় আর সহস্র দেবতার দেশ। কুলুর অঙ্গে অঙ্গে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী কিংবদন্তী। রঘুনাথজী কুলুর সবচেয়ে সম্মানিত দেবতা। এ-ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট ঋষিরা কুলুভূমিকে পুণ্যভূমি করেছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের থেকে কুলু দশেরার বৈশিষ্ট্য আছে। বিজয়াদশমীর দিন এখানকার উৎসব শুরু হয়ে সাতদিন ধরে চলে। কুলুর ঢালপুর ময়দানে দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা এসে দোকান সাজিয়ে বসে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর তাদের প্যাভিলিয়ন সাজায়।

উৎসবের প্রথম দিন সুসজ্জিত রথে রঘুনাথজীকে তাঁর মন্দির থেকে

ঢালপুর ময়দানের একধারে এনে রাখা হয়। তারপর তাঁর ভক্তরা রথের দড়ি ধরে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ঢালপুর ময়দানের অন্যপ্রান্তে ধুমধাম বাদ্যভাণ্ডসহকারে টেনে নিয়ে যায়। 'রথযাত্রা'র তাৎপর্য হলো রাবণের পরাজয় ও রামের জয়যাত্রা। দশমীর দিন এই রথটানার পরে পূর্ণিমা পর্যন্ত রঘুনাথজী সেখানে অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে কুলুর আশেপাশের বিশ-ত্রিশ মাইল দূরের গ্রামবাসীরাও তাদের নিজ নিজ গ্রামের দেবতাকে নিয়ে আসে রঘুনাথজীর দরবারে সম্মান জানাবার জন্যে। কুলুর সব গ্রামেই আলাদা আলাদা দেব-দেবী। কিন্তু তাঁরা সবাই রঘুনাথজীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

হিমাচলের বিভিন্ন অংশ আগে বহু দেশীয় রাজার শাসনে ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে রাজা জগৎসিংহ এই দশেরা-উৎসবের সূচনা করেন। কিন্তু অযোধ্যার সরযূতীর নিবাসী রামঘুমনি এই বিপাশা নদীর পাড়ে পাহাড়ী কুলু উপত্যকায় কেমন করে এলেন? কি করে পুজো পেলেন অন্য সব দেবতার? তার পেছনে এক প্রাচীন কাহিনী।

কুলুর রাজা জগৎসিংহ ছিলেন খুব স্বেচ্ছাচারী আর ধনলোভী। ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারতেন না। কোনো প্রজার ঘরে পছন্দমতো কোন কিছু দেখলে জোর করে তিনি তা ছিনিয়ে নিতেন। কুলুর ধনী লোকেরা তাই ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গরীবের মতো থাকত, আর চেষ্টা করত যাতে তাদের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যারা জগৎসিংহের নজরে না আসে।

রাজ্যে তিপ্রিগ্রামে দুর্গা দত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার ঘরে ছিল এক মহার্ঘ্য রত্ন। রাজার কানে এক সময় এই খবর পৌঁছুল। সঙ্গে সঙ্গে এক দঙ্গল সিপাহি পাঠিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সেই রত্ন নিয়ে আসবার জন্যে। কিন্তু সৈন্যদের শত অত্যাচারেও দুর্গা দত্ত সেই অমূল্য বস্তু দিতে রাজী হলো না। সৈন্যেরা ক্রুদ্ধ হয়ে পাশবিক পীড়ন শুরু করল দুর্গা দত্তের উপর। সেই অত্যাচারে অসহ্য হয়ে উঠলে সে স্বয়ং রাজার হাতেই রত্নটি সমর্পণ

করতে রাজী হলো। সিপাহিরা সেই খবর নিয়ে ফিরে গেল রাজার কাছে। জগৎ সিংহ এই সংবাদ পেয়ে নিজেই চললেন দুর্গা দত্তের কাছ থেকে রত্নটি নেবার জন্যে। এদিকে ব্রাহ্মণ দেখল যে—তার এই বহুমূল্য সম্পদ বাঁচাবার আর উপায় নেই—যাকে সে মনে করত তার সব সুখ-সৌভাগ্য-সম্পদের উৎস, প্রাণের চেয়ে প্রিয়। তাই রাজা তিপ্রিগ্রামে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমস্ত পরিবারসহ সেই আগুনে সে জীবন্ত পুড়ে মরতে গেল। মরার আগে দুর্গা দত্ত নিজের শরীরের মাংস কেটে কেটে আগুনে ফেলে বলতে লাগল—রাজা, এই নাও রত্ন—এই নাও মাণিক্য।... সেই অমানুষিক দৃশ্যের স্মৃতি নিয়ে রাজা রাজধানীতে ফিরলেন। দুর্গা দত্তের আত্মা যেন তার পিছু পিছু তাড়া করতে লাগল। ব্রাহ্মণের মর্মন্তুদ আত্মহত্যার ঘটনায় শুরু হলো তার বিবেক-দংশন। রাত্রে যখন সোনার থালায় রাজা খেতে বসেছেন—দেখেন সব খাবারের মধ্যে রক্ত আর তার ভিতরে চরে বেড়াচ্ছে পোকা। রাজা আবার নতুন খাবার আনতে বললেন পরিচারিকাকে। কিন্তু যতবারই আহার্য আনা হলো—রাজা সব থালাতে দেখতে পেলেন রক্তের মধ্যে পোকা কিলবিল ক'রে হাঁটছে। বিপর্যস্ত, অনুতপ্ত, বিনিদ্র রাজা পরদিন প্রভাতে কুলুর প্রাচীন রাজধানী নগরে গেলেন। সেখানে বাস করতেন কুলু অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক বৈরাগী সাধু শ্রীকৃষ্ণদাস। তাঁর কাছে আপন পাপের কথা ব্যক্ত করে জগৎসিংহ উদ্ধারের উপায় জানতে চাইলেন। সব শুনে কৃষ্ণদাসজী বললেন রাজার উপর ব্রহ্ম-হত্যার পাপ লেগেছে। জগৎসিংহ জিজ্ঞেস করলেন—কি করে তার ব্রহ্মহত্যার পাপ কাটবে? কৃষ্ণদাসজী বললেন—রাজাকে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তারপর অযোধ্যাপুরী থেকে রামচন্দ্রজীর মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করে আপন রাজ্য রঘুনাথজীর নামে উৎসর্গ করে সারা-জীবন তাঁর সেবক হয়ে রাজকার্য চালালেই ব্রহ্মহত্যার পাপ খণ্ডন হতে পারে।

রাজা কৃষ্ণদাসজীর এক সেবক দামোদর দাসকে ভার দিলেন অযোধ্যা থেকে রঘুনাথজীর মূর্তি আনবার।

দামোদর অযোধ্যায় গিয়ে অনেকদিন কাটাল রঘুনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে। ভাব করল সেখানকার পুরোহিত ও অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে মন্দির থেকে রামচন্দ্রজীর মূর্তি নিয়ে কুলুর দিকে ছুট। কিন্তু ইতিমধ্যে পূজারী এসে দেখে যে কুলুর ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রজীর মূর্তি নিয়ে পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেও দামোদরের পিছে পিছে ছুটল। ছুটতে ছুটতে একেবারে হরিদ্বারে এসে নাগাল পেল মূর্তিচোরের। ধরা পড়ে দামোদর বললে—রঘুনাথজী নিজেই কুলু যেতে চাইছেন।

কিন্তু এই কথার মীমাংসা কেমন ক'রে হবে? অযোধ্যার পূজারী মূর্তি তুলে নিতে গেল, কিন্তু বিগ্রহ ওঠাতে পারল না। তারপর দামোদর এসে হাত লাগাতেই মূর্তি উঠে এলো। দামোদর মহানন্দে রঘুনাথজীর মূর্তি এনে কুলুর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করল। রঘুনাথজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরে এই প্রদেশের সব এলাকার দেবতারা তাঁর প্রাধান্য মেনে নিলেন। এবং তারপরে রঘুনাথজীকে কেন্দ্র ক'রে শুরু হলো দশেরা উৎসব।



নিদাঘের হরিণী

দেশের রাজা একদা মৃগয়ায় গিয়ে একটি হরিণীকে ধরে বুনো লতা দিয়ে বেঁধে রাজধানীতে নিয়ে এসে পশুশালায় রেখে দিলেন। পশুশালার এই নবলব্ধ জীবটিকে দেখতে এসে তরুণ রাজকুমারের হৃদয় দ্রব হয়ে গেল বন্দিনী হরিণীর আয়ত চোখের মায়ায়। বন্ধন মুক্ত করে দিল সে। ত্রস্ত ভীত হরিণী চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

পশুশালার অধ্যক্ষ অচিরে এই সংবাদ রাজাকে জানালেন। ক্রুদ্ধ রাজা পরের দিন বিচারসভায় রাজকুমারকে ডেকে এনে বিচারের পরে তাকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন।

রাজ্যসীমা পার হয়ে সামনের এক ঘন অরণ্যের মধ্যে তখন প্রবেশ করছিল রাজকুমার। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য-রশ্মিও সেই গহন বনের মধ্যে বেশী আলো ছড়াতে পারে নি। ছায়া-ঢাকা অরণ্য পথে আনমনা চলতে চলতে হঠাৎ চমকে গিয়ে রাজকুমার দেখে—তার সামনে সেই বন্দিনী মৃগী যাকে সে মুক্ত করে দিয়েছিল। রাজকুমারের

বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে সেই হরিণী রূপান্তরিত হলো এক রূপসী তরুণীতে। যুক্ত করে সে রাজার ছেলেকে প্রণতি জানাল।

রাজপুত্র বললে—"ওগো হরিণী-মেয়ে, রাজরোষে এখন আমি এক নির্বাসিত মানুষ। তুমি আমার কাছে এসো না। কে জানে—হয়ত আমার সঙ্গে থাকলে তোমার জীবনেও বিপদ ঘনিয়ে আসবে।"

কিন্তু রাজপুত্রের কথায় কান না-দিয়ে সেই মেয়েটি তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রাজপুত্রের তৃষ্ণা পেয়ে গেল। এদিক ওদিক খানিকটা খুঁজে একটা ডোবা দেখতে পেল সে—তার নীচের দিকে একটুখানি জল। চারিধার ভালো করে দেখে যখনই জল খেতে নামবে তখনই তার চোখে পড়ে—ডোবার মধ্যে সাপের মুখে একটা ব্যাঙ। ব্যাঙটা তখনও চীৎকার করছে—"ক্রাও—ক্রাও—ক্রাও।" রাজপুত্র সাপটাকে মারতে গিয়েও মারল না। ভাবল—সাপ তো তার আহার যোগাড় করে নিয়েছে। ক্ষুধার্তের মুখ থেকে তার খাবার কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়। তাই সে নিজের ডান হাতের মাংস খানিকটা কেটে সেই সাপের মুখে ছুঁড়ে দিল। সাপ ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিয়ে সেই মাংসের টুকরোটা খেতে লাগল। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালাল ব্যাঙ। ইতিমধ্যে সঙ্গিনী মেয়েটি খাবার জল নিয়ে এসেছে। সেই জল খেয়ে আবার তারা পথ চলতে লাগল। ক্রমে এক রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে তারা প্রবেশ করল আর এক রাজ্যের মধ্যে।

নতুন রাজ্যের রাজধানী শহর থেকে যখন তারা দুজনে যাচ্ছিল রাস্তার পাশের দোকান থেকে তাদের দেখতে পেল নাপিত। মেয়েটির রূপ দেখে ক্ষৌরকার এমনই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে নিজের কাজেও ভুল হয়ে গেল তার। আচমকা তার হাতের ক্ষুরের খোঁচা লেগে গেল খদ্দেরের গালে। সে যন্ত্রণায় 'উঃ' বলে চেঁচিয়ে গাল দিল নাপিতকে। কিন্তু ক্ষৌরকার সেদিকে কান না-দিয়ে হাতের যন্ত্রপাতি ফেলে ছুটল রাজপ্রাসাদে। পুরু মখমলের পালঙ্কে বসে

রাজা তখন ঢুলছিলেন, বিরাট রঙিন পাখা নিয়ে হাওয়া দিচ্ছিল পরিচারিকারা। ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হয়ে নরসুন্দর বললে "মহারাজ, আপনার জীবনই ব্যর্থ, আপনার রাজপ্রাসাদ শ্রীহীন।'

রাজার ঘুমের আমেজ কেটে গেল। তার দুপাশের গোঁফ খাড়া হয়ে উঠল, উৎকণ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কেন রে ?"

"মহারাজ, আপনার রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি যাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখুন। এমন রূপসী তো শুধু আপনার প্রাসাদেই স্থান পাবার যোগ্য। এমন সুন্দরীর সঙ্গ ছাড়া আপনার জীবন যে নুনহীন ব্যঞ্জন।"—নাপিত বললে।

রাজা তাড়াতাড়ি পালঙ্ক থেকে উঠে গলা বাড়িয়ে দেখলেন—সত্যিই এক অপরূপ লাবণ্যবতী মেয়ে স্বামীসহ রাজপথ দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। সেই সতেজ রূপশ্রীকে দেখে রাজার মাথা ঘুরে গেল। একটু পরে স্থির হয়ে বললেন—"কিন্তু সঙ্গে যে ওর স্বামী। স্বামীর কাছ থেকে কি করে আমি ছিনিয়ে আনব এই রমণীয় কন্যাকে ?"

নাপিত বললে—"ওর স্বামীকে ডেকে এক কঠিন কাজের ভার দিন। বলুন এক পাত্র বাঘের দুধ এনে দিতে। না-পারলে তার জীবনদণ্ড।"

রাজা পরদিন প্রতিহারী পাঠিয়ে নগর প্রান্তের কুটির থেকে রাজকুমারকে ডেকে আনলেন। তারপর নাপিতের পরামর্শ মতো তাকে আদেশ দিলেন—"আজ সূর্যাস্তের আগে একপাত্র বাঘের দুধ এনে দাও। না-পারলে ঘাতকের হাতে প্রাণ যাবে তোমার।"

বিষণ্ণ মনে রাজপুত্র কুটিরে ফিরে আসে। হরিণী মেয়ে জিজ্ঞেস করে "কি হয়েছে ?" তারপর সব শুনে সে বললে—"চিন্তা কোর না। এক বাটি নয়, তুমি দু বাটি বাঘের দুধ নিয়ে যাবে রাজার কাছে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই বাটি দুটি নিয়ে পূব দিকের জঙ্গলে যাও। সেখানে বাঘিনীর দেখা পেলে সে যখন তোমাকে খেতে

আসবে—তোমার ডান হাত উপরে তুলো। বাঘিনী তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।"

রাজপুত্রের ডানহাতটি নিয়ে মন্ত্র পড়ে তাকে বনের মধ্যে পাঠিয়ে দিল হরিণী-মেয়ে।

গভীর বনের মধ্যে গিয়ে রাজপুত্র দেখে—সেখানে দুটি বাচ্চাসহ এক বাঘিনী ঘুমিয়ে আছে। হাওয়ায় ভেসে ভেসে যখন মানুষের গন্ধ নাকের মধ্যে ঢুকল—ঘুম ভেঙে গেল বাঘিনীর। সে লাফ দিয়ে রাজপুত্রের সামনে এসে তাকে খেতে গেল। রাজপুত্র ততক্ষণে তার ডানহাত উপরে তুলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী থেমে গেল। বুঝতে পারল—রাজপুত্র তার ছোট বোনের কাছ থেকে এসেছে তার দুধ নেবার জন্যে। নিজের থাবা দিয়ে বুকের দুধ দুইয়ে সে রাজপুত্রের দুটো বাটিই ভরে দিল। তারপর তার বাচ্চা দুটিকেও রাজপুত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল রাজধানীতে রাজার কাছে।

দু হাতের দু বাটিতে বাঘের দুধ, দুপাশে দুই বাঘের বাচ্চা—রাজপুত্রকে আসতে দেখেই রাজার ভিরমি খাবার অবস্থা! কোনো রকমে সামলে তিনি রাজকুমারকে চলে যেতে বললেন।

খবর পেয়ে একটু পরে নাপিত এসে হাজির। বললে, "ভয় পাবেন না মহারাজ, হতাশ হবেন না। ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে এনে নিশ্চয়ই আপনি আপনার হারেমের শোভা বাড়াতে পারবেন। ওর স্বামীকে কাল আপনি রাক্ষসদের দেশে পাঠিয়ে দিন। সেখানে রাক্ষসদের ক্ষেত থেকে আনতে বলুন সোনালী গম।"

পরের দিন রাজা তাই করলেন। আজও রাজপুত্র চিন্তিত হয়ে ঘরে ফিরলে হরিণী মেয়ে সব শুনে বললে—"চিন্তার কোনো কারণ নেই। গম আনবার ঝুড়ির উপরে লতা দিয়ে আমি সাঙ্কেতিক ভাষায় সংবাদ পাঠিয়ে দেব। সেই লেখা পড়ে রাক্ষসেরা তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না, বরং খুশী মনেই সোনালী গম দিয়ে দেবে।"

রাজপুত্র রাক্ষসের দেশে রওনা দিল। সেখানে গিয়ে দেখে বিরাট তাল গাছের মতো এক রাক্ষস ঘুমিয়ে আছে কাৎ হয়ে এক কান ভূমির উপর রেখে, অন্য কান আকাশের দিকে। রাজকুমার তার দিকে যেতে না-যেতেই মাটিতে তার পায়ের শব্দ কানে গেল রাক্ষসের। সঙ্গে সঙ্গে সে দুরন্ত ঝড়ের দমকা হাওয়া মুক্ত বাঁশগাছের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই রাজপুত্রকে মারতে গেল। কিন্তু রাজপুত্রের হাতের ঝুড়িতে লতার লিখন ততক্ষণে তার নজরে পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজকুমারকে মহাসমাদরে ঝুড়িভর্তি সোনালী গম দিয়ে তার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে এলো। সেই দৃশ্য দেখে রাজা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন, প্রায় অজ্ঞান হয়েই পড়েন আর কি! রাজবৈদ্য কোন রকমে তাকে সুস্থ করে তোলেন। রাজার শরীর ঠিক হলে তখনই নাপিতকে নিয়ে আসবার জন্যে প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলেন।

নাপিত এসে সব দেখে শুনে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। তার কপালের কোঁচকানো রেখাগুলিতে সাপের কুটিলতা এঁকে বেঁকে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে—"হ্যাঁ, মহারাজ, এবার আর বাছাধন পার পাবে না। এক কাজ করুন। আপনি মহারাণীর হীরের হার ঐ পুষ্পমহলের গভীর কুয়োর মধ্যে ফেলে দিন। তারপর ওকে ডেকে বলুন সূর্য ডোবার আগে তুলে আনতে।"

পরের দিন রাজপুত্রকে ডেকে রাজা বললে—"পুষ্পমহলের কুয়োর মধ্যে মহারাণীর হীরক হার পড়ে গেছে। যাও, এক্ষুনি তুলে আনবার কাজে লেগে যাও। আর যদি সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়বার আগে হার না-নিয়ে আসতে পার তোমার গর্দান যাবে।"

কুমার ঘরে ফিরে হরিণী কন্যাকে সব কিছু বলল। এবার হরিণী-মেয়ে ও হীরের হার তুলে আনবার কোনো উপায় খুঁজে নাপেয়ে বাক্‌হারা। কুয়োটা ছিল খুবই গভীর আর পিছল।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল মাথা নীচু করে। রাজপুত্র ভাবল—এবার তার জীবন শেষ। এমন সময় ঘরের মধ্যে 'গ্যাঙর গ্যাঙ-গ্যাঙ' শব্দ! বনের মধ্যের সেই ব্যাঙ আর সাপ এসে হাজির। তারা ওদের চিন্তা করতে বারণ করে তখনই রাজবাড়ির পুষ্পমহলে গিয়ে কুয়ো থেকে রাণীর হার তুলে নিয়ে এলো। রাজকুমার হাসি-মুখে রাজাকে দিয়ে এলো সেই হার।

পরের দিন রাজপ্রাসাদে গিয়ে নাপিত শুনল যে মহারাণীর হীরের হার তুলে দিয়ে গেছে সেই যুবক। রাজা বললেন—"আর কিছু করার নেই। এই যুবকের উপর অলৌকিক শক্তির আশীর্বাদ আছে।"

নাপিত বললে—"মহারাজ, ঘাবড়াবেন না—নিরাশ হবেন না। শেষ চেষ্টা করা যাক। এক্ষুনি এমন একটা শক্ত কাজ ভেবে বার করছি—যা করা মানুষ তো দূরে থাক, দেবতা বা দানবের পক্ষেও সম্ভব নয়। ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি। আপনি ঐ ছেলেটাকে ডেকে বলুন—এক রাতের মধ্যে এক ফলন্ত আমের বাগান বানিয়ে দিতে।... এবার বাছাধনের সব জারিজুরি শেষ। এ-কাজ আর করতে হচ্ছে না। এক রাতের মধ্যে ফলভরা গাছের বাগান! কি করে বানাবে? ...আপনি আপনার নতুন রাণীর জন্যে নতুন মহলের ব্যবস্থা করুন। আনন্দের বন্যা বইয়ে দিন রাজ্যের মধ্যে। রাজপ্রাসাদ আলোক মালায় সাজানো হোক—"

নতুন কাজের ভার পেয়ে এবারে রাজপুত্রের মন একেবারেই ভেঙে গেল। তিন তিন বার সে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। কিন্তু এক রাতের মধ্যেই ফলন্ত আমের বাগান—একেবারেই অসম্ভব।

হরিণী নারী বললে—"চিন্তা কোর না। শান্তিতে রাতের খাবার খেয়ে নাও। আজ রাতের মধ্যেই আমি এক অপূর্ব ফলের বাগান বানিয়ে দেব।"

রাজপুত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তাকে একটা তরবারি আর খানিকটা নুন আনতে বলল সে। সেই নুন দিয়ে ঘষে ঘষে তরবারিটিকে খুব ধারালো ঝকঝকে করতে বলল রাজপুত্রকে।

রাজপুত্র সেইভাবে কাজ করলে সে বললে—"গ্যাখো, আবার আমি হরিণী হয়ে যাচ্ছি। হরিণী হয়ে এলাকার চারিদিকে আমি দৌড়ে ঘুরে আসব। যেদিক দিয়ে আমি দৌড়ে আসব—সেখানে সেখানে ফলন্ত আমের বাগান হয়ে যাবে। তারপর বাগান বানানো হয়ে গেলে যখন আমি তোমার কাছে এসে দাঁড়াব তখনই এই তরবারি দিয়ে আমার গলা কেটে ফেলো।"

শুক্লপক্ষের রাত্রির আকাশে চাঁদ ভেসে উঠতেই ঘরের বাইরে গিয়ে দৌড়ুতে শুরু করল, আর যেখান যেখান গেল সেখানেই ফল-ভারানত আমের গাছ গজিয়ে উঠতে লাগল। তারপর পুরোপুরি এক বাগান হয়ে গেলে যখন সে কাছে এসে দাঁড়াল—রাজপুত্র সেই তরবারির এক আঘাতে তার গলা কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেই হরিণী আবার ফিরে পেল তার নারীরূপ।

পরদিন প্রভাতে রাজা যখন সেই ফলন্ত আম্রকানন দেখলেন তার বাক্যস্ফূর্তি হলো না। নিষ্ফল হলো তার সকল প্রচেষ্টা। তার লম্বা গোঁফ ঝুলে পড়ল গালের দু দিকে। নাপিতের মুখের সামনে চির-দিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল রাজপ্রাসাদের দরজা।

* * *

কিছুদিন পরে রাজপুত্র নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে মনস্থ করল। যাত্রা শুরু করে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা সেই জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে হরিণী সুন্দরী কন্যার রূপ পেয়ে রাজপুত্রের অনুগামিনী হয়েছিল। সেখানে পৌঁছে হরিণী-নারী বললে—"আমার সময় পূর্ণ হয়েছে। এবার আমি আমার আপন জনের মধ্যে ফিরে যাব, তুমি তোমার পিতার কাছে।"

—এই কথা বলে হরিণীকন্যা রাজপুত্রের ডান হাতখানি নিজের

হাতের মধ্যে নিয়ে একটুখানি রাখল, তারপর ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ আবার হরিণীতে রূপান্তরিত হয়ে গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেল।

রাজপুত্রের কাছে এতদিনের ঘটনা মনে হলো ছায়াচ্ছন্ন মধ্যাহ্নের স্বপ্নের মতো। সেই নির্জন নিঃসঙ্গ অরণ্যে তার মনের মধ্যে জেগে থাকল শুধু এক জোড়া আয়ত গভীর চোখের কাজল-কালো নিদাঘ-মায়া।



কিন্নরের দুঃখী রাজকুমার ও রাজকুমারী

হিমাচলের কিন্নরজেলার প্রধান শহর কল্পা। কল্পার কাছে পাঙ্গি গ্রাম। পাঙ্গি অঞ্চলে অনেকদিন আগে শার নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তার রাণীর নাম ছিল লাগজুমা। রাণী ছিলেন খুব ভক্তিমতী ও দয়ালু। তাদের একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। মেয়ের নাম লাটি শরযাঙ্গ আর ছেলের হিনাদাগুব।

রাণী লাগজুমার একবার খুব অসুখ হলো। চিকিৎসার জন্যে রাজা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের নিযুক্ত করলেন। প্রবীণ লামা-পুরোহিতরা ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। কিন্তু রাণীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। লাগজুমা একদিন রাজাকে ডেকে বললেন—"আমি আর বাঁচব না। তুমি যদি আমাকে একটা কথা দাও তো আমি শান্তিতে মরতে পারি।"

রাণীকে খুব ভালোবাসতেন রাজা। বললেন—"আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।"

লাগজুমা তখন বললেন—"আমি এই দুটো ছেলেমেয়েকে এক-মাত্র তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি। তুমি ওদের ভালোভাবে দেখাশুনা কোরো যেন আমার মৃত্যুর পরেও ওরা মায়ের অভাব বুঝতে না পারে। আর কথা দাও—আমি মারা গেলে তুমি আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে না।"

শার রাণীকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার কথা তিনি পালন করবেন। লাগজুমা রাজার প্রতিশ্রুতির পরে শান্তিতে চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাজার আর শোকের সীমা রইল না।

শার ছিলেন খুব ভালো শিকারী। রাণীর মৃত্যু শোক সামলিয়ে উঠে কিছুদিন পরে আবার তিনি অনুচরদের নিয়ে শিকারে যেতে শুরু করলেন।

শার যখনই জঙ্গলের মধ্যে শিকারে যান দেখেন—সোনালী চুলের একটি সুন্দরী মেয়ে তার সামনে কোথাও বসে থাকে। শার তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও সেই সুন্দরী রমণী রাজার দিকে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে বা কোনো মন্তব্য ক'রে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। রাজা শার শিকারে গেলেই এইভাবে রাজার কাছে আসবার ও কথা বলবার চেষ্টা করে সেই স্বর্ণকেশী নারী। অবশেষে একদিন শার শিকারে এসে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কে? কি চাও তুমি?"

সেই অপরিচিতা সুন্দরী কোনো উত্তর না-দিয়ে শুধু মধুর ভঙ্গীতে হাসল। তার সোনালী চুল উড়তে লাগল হাওয়ায়।

নিজের অজান্তেই রাজা সেই রূপসীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী মারা গেছে। তুমি কি আমার নতুন রাণী হবে?"

স্বর্ণকেশী উত্তর দিলে—"আমি কি ক'রে তোমাকে বিয়ে করব? আমি স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দনকাননের অপ্সরা। তুমি তো মানুষ। তোমাকে বিয়ে করলেই আমার শরীর ছাই হয়ে যাবে!"

"আমি সাধারণ মানুষ নই। আমি রাজা শার। আমার অনেক শক্তি। তোমার সুন্দর শরীরকে আমি ছাই হতে দেব না।"—রাজা দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বাস দিলেন।

স্বর্ণকেশী এটাই চাইছিল। রাজার সঙ্গে সে প্রাসাদে এলো।

আসলে সে কিন্তু নন্দনকাননের অপ্সরা নয়। সুন্দর চেহারার ছদ্মবেশে সে ছিল এক জাদুকরী রাক্ষসী।

এদিকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠেছে রাজকুমারী লাটি শরযাঙ্গ ও রাজকুমার হিনাদাণ্ডুব। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তারা দুজনে একসঙ্গে খেলাধুলা করে। সন্ধ্যের সময় শার শিকার থেকে ফিরে এলেই তারা বাবার কাছে যেত। রাজা ছেলেমেয়েদের আদর করে প্রাসাদের মধ্যে চলে যেতেন।

সেদিন স্বর্ণকেশীকে নিয়ে শার প্রাসাদে ফিরলে অন্যদিনের মতো হিনাদাণ্ডুব ও শারযাঙ্গ দৌড়ে বাবার কাছে গেল। তাদের দেখে স্বর্ণকেশীর একদম ভালো লাগল না। রাজা ছেলেমেয়ের সঙ্গে স্বর্ণ-কেশীর পরিচয় করিয়ে দিলেন—"এ তোমাদের নতুন মা। তোমাদের মা মারা যাবার পরে এতদিন আমি বিয়ে করিনি। এঁকে তোমরা মায়ের মতো সম্মান দেবে।"

রাজা স্বর্ণকেশীকে বললেন—"এরা আমার আগের রাণী লাগজুমার সন্তান এখন থেকে তোমারও ছেলে-মেয়ে। তুমি এদের মায়ের মতো স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ো।"

হিনাদাণ্ডুব ও লাটি শরযাঙ্গ তাদের নতুন মাকে পেয়ে খুশী। কিন্তু স্বর্ণকেশী আগের রাণীর এই ছেলেমেয়ে দুটিকে প্রথম থেকেই বিষদৃষ্টিতে দেখল। কি ভাবে এদের মেরে ফেলা যায় সব সময় তার মনে সেই কুটিল চিন্তা সাপের মতো কিলবিল করতে লাগল।

রাজধানীর শেষপ্রান্তে বনের মধ্যে থাকত এক দুষ্ট যোগিনী। নানারকম ঝাঁড়-ফুক ও দুরারোগ্য জটিল অসুখ-বিসুখের জন্যে লোকেরা তার কাছে যেত। নতুন রাণী স্বর্ণকেশী মনের মধ্যে এক মতলব এঁটে তাকে প্রাসাদে ডেকে পাঠাল। যোগিনী এলে স্বর্ণকেশী তাকে বলল—"তুমি যদি আমার কথামতো কাজ করো তোমাকে টাকাপয়সা পুরস্কার দেব। আর যদি কথা না-শোনো তো রাজাকে বলে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়াব।"

মৃত্যুভয় টাকার লোভে সেই দুষ্ট যোগিনী স্বর্ণকেশীর কথা মতো কাজ করতে রাজী হলো। রাণী বললে—"শোনো, আজ আমি অসুখের ভান করব। রাজা যখন তোমাকে চিকিৎসার জন্যে ডেকে পাঠাবে তখন আমাকে পরীক্ষা ক'রে তুমি বলো যে—রাজার ছেলে ও মেয়ের হৃৎপিণ্ড নিয়ে ওষুধ বানাতে হবে। রাজার ছেলে-মেয়ের হৃৎপিণ্ড দিয়ে ওষুধ বানিয়ে না-খাওয়ালে আমার অসুখ ভালো হবে না।"

যোগিনীকে বিদায় দিয়ে স্বর্ণকেশী অসুখের ভান ক'রে চীৎকার করতে শুরু করল। শুনে রাজা শায় ছুটে এলেন। রাজবৈদ্যকে ডাকা হলো, কিন্তু তার ওষুধে কোনো ফল হলো না। রাণী সমানে চীৎকার ক'রে যাচ্ছে। তখন যোগিনীকে ডাকা হলো স্বর্ণকেশীর এই বিষম ব্যাধি উপশমের জন্যে। যোগিনী এসে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে বললে—"ব্যাধি বড় ভয়ানক। এর জন্যে ওষুধ চাই ভয়ানকতর।"

রাজা জানতে চাইলেন কি সে ওষুধ। তখন যোগিনী বললে যে—রাজকুমার হিনাদাগুব ও রাজকুমারী শরযাঙ্গের হৃৎপিণ্ড দিয়ে ওষুধ রাণীকে খাওয়াতে হবে। তবে তার অসুখের শান্তি।

রাজা এই কথা শুনে ভীষণভাবে চমকে গেলেন। নতুন রাণীর জন্যে কিভাবে তিনি নিজের ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলার আদেশ দেবেন?

ওদিকে স্বর্ণকেশী যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে যাচ্ছে, তার প্রাণ যায় যায়! স্বর্ণকেশীর এই কষ্ট রাজা আর সহ্য করতে পারলেন না। বিষণ্ণ মনে তিনি ছেলেমেয়েদের জঙ্গলে নিয়ে মেরে ফেলে তাদের হৃৎপিণ্ড আনবার আদেশ দিলেন। যোগিনীকে নির্দেশ দিলেন সেই হৃৎপিণ্ড দিয়ে ওষুধ বানিয়ে শীঘ্র রাণীর রোগের উপশম করতে।

রাজার লোকেরা রাজকুমার-রাজকুমারীকে নিয়ে জঙ্গলে গেল মারবার জন্যে। সেখানে তাদের হাত-পা বেঁধে একখণ্ড পাথরে বসিয়ে যখনই তাদের মারতে যাবে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে রাজকুমার-

রাজকুমারীর বহুদিন আগে সংসার ত্যাগী মামা বেরিয়ে এলো। জহ্লাদদের তীব্রভাবে ধিক্কার দিয়ে সে বলল—"রাজা না-হয় শয়তানী স্বর্ণকেশীর প্রভাবে বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তোমাদের তো বিবেকবুদ্ধি আছে! কোন্ দোষে এই নিরাপরাধ ছেলেমেয়ে দুটিকে তোমরা মারতে যাচ্ছ?"

কিন্তু রক্ষী দুজন তার কথায় কান দিল না। বরং তাকে মেরে-ধরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর সেই অসহায় ছেলেমেয়ে দুটিকে তারা সেখান থেকে করুকসেরাং ঝিলের পারে নিয়ে আবার তাদের মেরে ফেলতে উদ্যোগী হলো। তখন সেই ঝিলের মধ্য দিয়ে মৃত মহারাণী লাগজুমায় আত্মা এসে ঘাতকদের বললেন—"তোমাদের রাজার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। রাক্ষসী স্বর্ণকেশীর মায়ায় মোহগ্রস্ত হয়ে নিজের ছেলে-মেয়েকে মারবার আদেশ দিয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি আমার এই ছেলে-মেয়ে দুটিকে মেরে ফেলো তোমাদের উপর বজ্রাঘাত হবে। আমি এখনই ঝড়ের দেবতাকে ডেকে ভয়ানক তুষার-বৃষ্টি শুরু করব।"

মৃত মহারাণীর এই কথা শুনে রক্ষী দু'জন ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারা মহারাণীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। শরযাঙ্গ আর হিনাদাণ্ডুবকে মুক্ত ক'রে দিয়ে তারা বললে—"তোমরা এখান থেকে পালিয়ে দূরে অন্য কোনো রাজ্যে চলে যাও। যদি রাজা কোনোক্রমে জানতে পারেন যে আমরা তোমাদের ছেড়ে দিয়েছি তবে আমাদের ঘাড়ে মাথা থাকবে না। আমরা বাঁদর বা অন্য কোনো জন্তু মেরে তার হৃৎপিণ্ড রাজাকে দিয়ে দেব।"

—এই কথা বলে রক্ষী দু'জন চলে গেল। শরযাঙ্গ আর হিনাদাণ্ডুব জননীর আত্মার প্রতি প্রণাম জানিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পালাতে লাগল। কিন্তু তারা বাইরে যাবার রাস্তা খুঁজে পেল না, বরং আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল। হিনাদাণ্ডুব বলল—"দিদি, আর আমি চলতে পারছি না। যন্ত্রণায় আমার পা

ভেঙে আসছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। আমাকে শীগগীর খাবার জল এনে দাও।"

ভাইয়ের অবস্থা দেখে শরযাঙের খুব কষ্ট হলো। সে তাড়াতাড়ি ভাইয়ের জন্যে জল আনতে গেল। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও সে ফিরে আসছে না দেখে হিনাদাগুব জঙ্গলের মধ্যে দিদির খোঁজে বার হলো। কিন্তু দিদিকে সে আর খুঁজে পেল না। বরং সেই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে দু'দিকে হারিয়ে গেল দুই ভাই-বোন।

হিনাদাগুব হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের ধারে একটি কুটির দেখতে পেল। সেখানে ছিল দুই বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী। হিনাদাগুব তাদের কাছে গিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ল। সেই বৃদ্ধ দম্পতি তাকে যত্নের সঙ্গে খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে তুলল। তার সুন্দর চেহারা ও ব্যবহারে তারা বুঝতে পারল—এই ছেলেটি খুব ভালো ঘরের সন্তান।

সেদিন আবার সেই রাজ্যে নতুন রাজা নির্বাচন করা হচ্ছিল। কারণ আগের রাজা মারা গিয়েছেন এবং সেই রাজার কোনো ছেলে-মেয়ে বা উত্তরাধিকারী ছিল না। রাজার মন্ত্রিবর্গ এবং সভাসদরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রাজপ্রাসাদের জ্ঞানী তোতাপাখীর কাছে একটি ফুলের মালা রাখা হবে। তোতাপাখী সেই মালা নিয়ে যার গলায় পরিয়ে দেবে তাকেই তারা রাজা বলে বরণ করে নেবেন।

হিনাদাগুবকে ভালো কাপড়-চোপড় পরিয়ে সেই বৃদ্ধ দম্পতি তাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের কাছে গেল নতুন রাজা নির্বাচন-উৎসব দেখতে। খেয়ে-দেয়ে ভালো কাপড়-জামা পরে হিনাদাগুবকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল। তারা রাজপ্রাসাদের অদূরে একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়াল।

ঠিক সময়ে তোতাপাখীর মুখে একটি মালা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো। হাজার হাজার নর-নারী উৎসুকভাবে রাজপ্রাসাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তোতাপাখী কার গলায় মালা পরায় দেখবার জন্যে।

তোতাপাখী উড়তে উড়তে হিনাদাণ্ডুবরা যে-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল সেই গাছের উপর একটা ডালে বসল আর তারপর হিনাদাণ্ডুবের গলায় মালাটি ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই জয়ধ্বনি করে, হিনাদাণ্ডুবকে সজ্জিত ঘোড়ায় পিঠে চাপিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে এলো। শুভদিনে লামাদের মন্ত্র-উচ্চারণ ও আলোক-সজ্জা বাদ্য-সমারোহের মধ্যে তার অভিষেক হলো।

কিন্তু রাজা হয়েও হিনাদাণ্ডুবের মনে সুখ নেই। সে সব সময় তার হারিয়ে-যাওয়া দিদির কথা চিন্তা করে। চারিদিকে লোকজন পাঠিয়েও সে শরযাঙ্গকে খুঁজে বার করতে পারেনি। ওদিকে শরযাঙ্গও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাইয়ের খোঁজে। দুঃখে-কষ্টে সে অনেকটা পাগলের মতো। জঙ্গলের মধ্যে কোনো হাড়ের টুকরো দেখলে সে ভাবত এগুলি বুঝি তার ভাইয়ের মৃতদেহের কঙ্কালের হাড়। সেই হাড় দিয়ে মালা বানিয়ে সে গলায় পরত। তারপর ঘুরতে ঘুরতে হিনাদাণ্ডুব যেখানে রাজা হয়ে বসেছিল একদিন সেই রাজধানীতে এসে পৌঁছল। শরযাঙ্গ তখন সন্ন্যাসিনী, তার কণ্ঠে গুঞ্জিত করুণ-মধুর সঙ্গীত। লোকে তার মিষ্টি স্বরে আকৃষ্ট হয়ে তার গান শুনতে ভিড় করে। ক্রমে এই তরুণী সন্ন্যাসিনীর গান এমনই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে তার খ্যাতির কথা রাজা হিনাদাণ্ডুবের কানেও পৌঁছয়। সে সন্ন্যাসিনী-গায়িকাকে ডেকে পাঠায়। শরযাঙ্গ যখন গান গাইতে গাইতে রাজপ্রাসাদে ঢুকছিল তার গান হিনাদাণ্ডুবের কানে গেল। দিদির সুমধুর গলার কথা মনে পড়ল তার। সে এক-জন রক্ষীর হাতে এক থালা গম দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিল গায়িকা-সন্ন্যাসিনীর পায়ের ছাপ আনতে। তারপর ভৃত্য যখন সেই পায়ের ছাপ নিয়ে তার কাছে এলো সে সঙ্গে সঙ্গে তার দিদি শরযাঙ্গের পদ-চিহ্ন চিনতে পারল। হিনাদাণ্ডুব সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে ছুটে নীচে সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে দুই ভাই-বোনের চোখে জলের ধারা বইতে লাগল। হারানো ভাইকে ফিরে

পেয়ে শরযাঙ্গের খুশীর সীমা রইল না। হিনাদাণ্ডুব মহাসমাদরে দিদিকে অন্তঃপুরে নিয়ে এলো। তার জন্যে আনা হলো উৎকৃষ্ট আহার, শ্রেষ্ঠ বস্ত্র-অলঙ্কার।

আনন্দের মধ্যে দুই ভাই-বোনের দিন কাটতে থাকে। তারপর একদিন হিনাদাণ্ডুব বললে—"যদিও আমাদের পিতা আমাদের উপর খুবই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন তা হলেও আমি একবার তাঁর কাছে যাব। বিশেষ ক'রে রাক্ষসী স্বর্ণকেশী ও দুষ্ট যোগিনীকে আমি শাস্তি দিতে চাই।"

শরযাঙ্গ ভাইকে নিবৃত্ত করতে চাইল—"এখানে আমরা দুই ভাই বোন তো শান্তিতে আছি। কি হবে আর সেই পুরনো রাজ্যে ফিরে গিয়ে?"

কিন্তু হিনাদাণ্ডুব সে কথা শুনলে না। দিদিকে নিয়ে একদিন সে নিজের দেশে ফিরে এলো। তারা রাজপ্রাসাদে গেল রাজা শার-এর কাছে। স্বর্ণকেশীর খপ্পরে পড়ে তার তখন খুবই খারাপ অবস্থা। জামা-কাপড়ের কোনো ছিরি ছাঁদ নেই। শরীর ভেঙে পড়েছে। পিতার এই অবস্থা দেখে তাদের খুব দুঃখ হলো। পরাক্রমশালী রাজা শার বিছানায় শুয়ে ধুঁকছিলেন।

জীবিত হিনাদাণ্ডুব ও শরযাঙ্গকে ঝলমলে রাজকীয় পোশাকে দেখে শার অবাক হয়ে গেলেন। নিজের ছেলেমেয়েকে চিনতে পেরেও তাঁর সন্দেহ যাচ্ছিল না। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কি আমার শরযাঙ্গ আর হিনাদাণ্ডুব?"

হিনাদাণ্ডুব উত্তর দিলে—"হ্যাঁ। বাবা, আমরা বেঁচে আছি। যদিও আপনি রাক্ষসীর মায়ায় ভুলে আমাদের মেরে ফেলবার জন্যে ঘাতকদের হাতে দিয়েছিলেন। এখন সেই স্বর্ণকেশীর হাতেই আপনার কী দুর্দশা হয়েছে!"

ছেলের কথা শুনে রাজার চোখ জলে ভরে গেল। তিনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শার ছেলেমেয়েদের তার কাছে ডাকলেন।

দুই ভাইবোনের হাত নিয়ে বুকের উপর রেখে একদৃষ্টিতে তার কান্নাভেজা মুখে এক ধরনের তৃপ্তির আলো ফুটে উঠল। তারপর বালিশের একদিকে ঢলে পড়ল। মারা গেলেন তিনি।

হিনাদাগুব শোকাকুল দিদিকে নিয়ে যখন প্রাসাদের বাইরে আসছিল পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবার জন্তে তখন স্বর্ণকেশী বাইরে থেকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকছিল। তার কাঁধে ঝুলছে একটা মরা কুকুর। হিনাদাগুবকে দেখেই সে তাকে চিনতে পেরেছে। কোমরে গোঁজা একটা ছুরি নিয়ে সে মারতে গেল হিনাদাগুবকে। কিন্তু তার আগেই হিনাদাগুব তীর ছুঁড়ে মারল স্বর্ণকেশীর দিকে। তীর গিয়ে বিঁধল ঠিক স্বর্ণকেশীর বুকে। শেষ হয়ে গেল তার জীবন।

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে স্বর্ণকেশীর দেহও সে সমাধিস্থ করল একটা পাহাড়ের কাছে পাথর চাপা দিয়ে।

কিছুদিন পিতার রাজ্যে কাটিয়ে দুই ভাইবোন আবার তাদের রাজ্যে ফিরে এলো। নির্বিঘ্নে পরম শান্তিতে তারা বাস করতে লাগল সেখানে।

ওদিকে মরার পরেও স্বর্ণকেশী লোকেদের নিশ্চিন্তে থাকতে দেয় নি। প্রেত হয়ে নানারকম রূপ ধরে লোকেদের ভয় দেখাত আর সুযোগ পেলেই তাদের ঘাড় মটকে দিত বা রক্ত চুষে খেত। লোকেরা তখন লামা ডেকে মন্ত্র পড়ে স্বর্ণকেশীর সমাধির উপরে একটা 'স্তূপ' (সমাধি-গৃহ) বানিয়ে ছিল। তারপর থেকে স্বর্ণকেশীর আত্মা আর বাইরে এসে উপদ্রব করতে পারত না।

স্বর্ণকেশীর সমাধির উপরে সেই 'স্তূপ' আজও দেখা যায় কিন্নর জেলার প্রধান শহর কল্পার কাছে, পাঙ্গি গ্রামে।



জোম্বা ও লুলু

"বাঁচাও—বাঁচাও—"

জোম্বা তখন ক্ষেতে কাজ করছিল বিকেলবেলায়। জোম্বা আফ্রিকার বেওয়া. উপজাতির একজন বয়স্ক কৃষক। একটি তরুণী মেয়ের মর্মান্তিক চীৎকারে চাষের কাজ বন্ধ করে সে তাকাল, দেখল মেয়েটি তার দিকেই প্রাণপণে. ছুটে আসছে। তার পেছনে তাড়া করছে মধ্য বয়স্ক একজন আফ্রিকান।

মেয়েটি জোম্বার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল—"আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—"।

শরণাগত মেয়েটি ও তার পশ্চাদ্ধাবনকারী ব্যক্তির মাঝখানে দাঁড়াল জোম্বা। লোকটি তারই বেওয়া উপজাতি আর মেয়েটি টুকুয়ু উপজাতির। সঙ্গে সঙ্গেই এদের কাহিনী বুঝতে পারল জোম্বা। মেয়েটিকে নিশ্চয়ই লোকটি শরণার্থীদের দল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে।

বেওয়া আর টুকুয়ু—দুটি উপজাতিই আগে আফ্রিকার দক্ষিণ সাহারার নিকটবর্তী মাকুটুপোরার অধিবাসী ছিল। বেওয়ারা ছিল সংখ্যাগুরু। তারা সব জায়গাতেই টুকুয়ুদের উপর আধিপত্য বিস্তার

করেছিল। এই দুটি উপজাতির আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ছিল আলাদা। ফলে এঁদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ লেগেই ছিল। যা হোক, কোনো ভাবে তারা একসঙ্গে মাকুটুপোরায় বাস করতে থাকে।

কিন্তু টুকুয়ুরা সর্বদা অভিযোগ করত যে মাকুটুপোরায় তাদের উন্নতির দিকে কারও নজর নেই। এই অসন্তোষের জন্যে তারা আলাদা বাসভূমি দাবী করল। বেওয়ারা তাদের এই দাবীর প্রচণ্ড বিরোধিতা করল। ফলে এই দুই উপজাতির মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হলো যা মাকুটুপোরার ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায় নি। অবশেষে মাকুটুপোরার সেনাধিপতি পুরু টুকুয়ুদের দাবী মেনে নিয়ে দেশ-বিভাগে সম্মতি দিলেন। মাকুটুপোরা ভেঙে গোণ্ডা নামে নতুন রাজ্যের জন্ম হলো।

নতুন রাজ্য জন্ম নেবার পরে অধিবাসীদের মধ্যে প্রবল-ভাবে দেশান্তরণ শুরু হলো। গোণ্ডাগোণ্ডায় যে সব বেওয়া বাস করত সীমান্ত পেরিয়ে তারা ফিরে এলো মাকুটুপোরায় আর মাকুটুপোরায় যেসব টুকুয়ু বাস করত তারা চলে যেতে লাগল গোণ্ডাগোণ্ডায়।

এই দেশান্তরণের ফলে লোকেদের দুঃখ দুর্দশার আর সীমা রইল না। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার পথে অনেক স্ত্রী-পুরুষ শিশু ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহার ও অসুখে মারা গেল। খঞ্জ পঙ্গু এবং অসুস্থ লোকেদের রাস্তায় ফেলে রেখে লোকেরা সীমান্ত পার হতে লাগল। দেশান্তর-রত শরণার্থীদের দুই উপজাতির লোকেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হলো। একে অন্য উপজাতির মেয়েদের উপর সুযোগ পেলেই অত্যাচার লাঞ্ছনা করতে লাগল।

জোম্বা এদের দুজনকে দেখেই বুঝতে পারল—টুকুয়ু উপজাতির দেশান্তরকামী শরণার্থী দল থেকে এই মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে বেওয়া উপজাতির মধ্যবয়স্ক এই লোকটি। মেয়েটিকে যদি পুরুষটি নিয়ে যায় তবে মেয়েটির ভাগ্যে রয়েছে অবধারিত অত্যাচার ও মৃত্যু।

জোম্বা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল কতো টাকা পেলে সে মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে। "পনের শ' শিলিং—" লোকটি উত্তর দিলে। জোম্বা লোকটিকে অপেক্ষা করতে বলে কাছেই তার বাড়ি থেকে সেই মুক্তি-মূল্য এনে নীরবে লোকটির হাতে দিয়ে দিল। টাকা নিয়ে চলে গেল সে।

মেয়েটির নাম লুলু। বয়স মাত্র সতের-আঠার। জোম্বার চেয়ে অনেক বছরের ছোট।

তাদের ভাষায় লুলু মানে 'মুক্তো।' যৌবনবতী মেয়েটি সত্যিই মুক্তোর মতো নিটোল, সুন্দর। শ্রান্তি আর আশঙ্কায় পদ্মপাতার উপর শিশির বিন্দুর মতো কাঁপছে।

জোম্বা এতদিনেও বিয়ে করেনি। মেয়েটি তার ঘরে এসে হলো তার আদরের খেলনা, কন্যা ও সঙ্গী। জীবন রক্ষার জন্যে লুলু শুধু কৃতজ্ঞই হলো না—সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলল জোম্বাকে। তারা বিয়ে করল। বিয়ের বছরখানেক পরে এলো একটি পুত্র-সন্তান। তার নাম রাখল—আমানি; আফ্রিকান ভাষায় যার অর্থ 'শান্তি।'
